পঞ্চম অধ্যায়

প্রতিবাদ থেকে সংঘাতের পথে, নারীর অজ্ঞাতপূর্ব অভিব্যক্তি, নির্বাচিত ছোটগল্পের নিবিড় পাঠ।

মহাশ্বেতা দেবী গোটা বিশ্ব দাপিয়ে ঘুরেছেন। পথভোলা পাখির মতো এক জায়গাতেই থেমে থাকেননি কখনো। সমস্যার শেকড় উৎঘাটনে অস্থির কিন্তু লক্ষ্যে স্থির তার চলার ও লেখার গতি। এই গতি পথেই সন্ধান করেছেন প্রকৃত ইতিহাসকে এবং সেই ইতিহাসের মূল সার বস্তুকে। এই ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে জীবনানন্দের মতো ক্লান্তি তাকে ছুঁতে পারে না। বরং বলা যায় বিনির্মাণের প্রচেষ্টায় তার চলার গতি যেন খরস্রোতা নদীর মতো, কখনো পিছিয়ে পরে না, থেমে থাকে না। রাবীন্দ্রিক উচ্চারণে বলা যায় 'ক্লান্তি আমায় ক্ষমা কর প্রভু।' এই ক্লান্তি তাকে কখনই আবৃত করতে পারেনি। এমনই চঞ্চল অস্থির জীবন যাপনে অভ্যস্ত মহাশ্বেতা দেবী। সর্বোদাই ছুটে চলেছেন এই ত্রিসীমানার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কখনও হত দরিদ্র শ্রেণির মানুষের কাছে, কখনো শোষিত শ্রেণির মানুষের কাছে, কখনো বা আদিবাসী বন জঙ্গলে বসবাসকারী হোম-মুন্ডা – সাঁওতাল শ্রেণির মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। যেখানেই অন্যায় দেখেছেন সেখানেই বিপদসঙ্কুল কোন কিছু

না দেখেই ঝাঁপিয়ে পরেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। অন্যায়কারী শাসিত শ্রেণির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দিয়েছেন নেতৃত্ব। আজও স্থির নেই, বয়সের উপান্তে এসেও বার্ধক্য তার গতিপথ রুদ্ধ করতে পারেনি। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলাই মহাশ্বেতার এক অন্যতম চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। আর এরই প্রত্যক্ষ প্রভাব পরেছে তার সাহিত্যে। তাইতো বয়ে যাওয়া সময়েই তিনি রচনা করেছেন নিত্য নতুন ইতিহাস। এই অনুসন্ধানী দৃষ্টির জন্যই মহাশ্বেতা ইতিহাস পাঠে মনোনিবেশ করেন। লেখিকা নিজেও সে কথাই বলেছেন,

> "ইতিহাস পাঠে আমার অনুরাগ এবং ব্যাপ্তি চিরকালই ছিল। তারপর জীবন থেকে পাঠ নেওয়া শুরু হল, যা আমার লেখার মূল ধারয়িত্রী সূত্র। হ্যাঁ ইতিহাস চেতনা আমার সমস্ত লেখাকে ধারণ করে আছে। আর সেই জন্য তথ্য নির্ভরতার প্রয়োজন আমার কাছে খুব বেশী। আমার প্রথম বই যেমন 'ঝাঁসিরানী', প্রথম উপন্যাস 'নটী' (১৯৫৭), তেমনি 'আধার মানিক', 'অমৃত সঞ্চয়', 'কবি বন্দ্য ঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', 'বিবেক বিদায় পালা', এমন কি এই কালের পটভূমিতে 'জল', 'স্তনদায়িনী' লেখার জন্য আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি তা বিচার করেছি। ব্যবহার করেছি। আমার লেখা যদি কেউ গুরুত্ব সহকারে পড়েন, আমি মনে করি তাঁকে জমি ভূমি ইতিহাসের বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা, সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ভাষা শোষক শোষিতের মধ্যবর্তী অনেক শাখা প্রশাখার উপস্থিতি, সব কিছুই জানতে হবে।"[১]

মহাশ্বেতা শোষক এবং শোষিতের শাখা প্রশাখার উপস্থিতি বলতে ক্ষমতার বহু কেন্দ্রিকতাকেই বুঝিয়েছেন। নিম্নবর্গের আদিবাসী সমাজের জীবন সঙ্কটই তাঁর সাহিত্যের মূল ইতিহাস হিসেবে উঠে আসে। মহাশ্বেতা তাঁর গল্পের মধ্যদিয়ে আমাদের শিখিয়ে দেন যে ইতিহাস মানে শুধুমাত্র রাজা-মহারাজা, বাদশা, জমিদার, জোতদার ও মহাজন শ্রেণির

জীবন যাপন প্রণালিই নয়। এই শ্রেণির মানুষের পাশাপাশি তার পার্শ্ববর্তী সমস্ত প্রজাপালি ও সমসাময়িক সময়ের সাধারণ মধ্যবিত্ত – নিম্নবিত্ত, কৃষক – শ্রমিক-মজুর এবং সর্বোপরি সামাজিক রাজনৈতিক চিত্রও প্রকৃত ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। তাইতো মহাশ্বেতার গল্পবিশ্ব নিম্নশ্রেণির নবনির্মিত ইতিহাসের গাথা কাহিনিতেই পরিপূর্ণ।

এই নিম্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে একেবারে ঘরোয়া পরিবেশেই নারী চরিত্ররা তাদের গোটা সম্প্রদায়ের নারীর স্বরূপ নিয়ে মহাশ্বেতার গল্পে আবির্ভূত হয়। তাদের প্রতি লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অবজ্ঞা, অবহেলা, নির্যাতন নারী ধর্ষণ এবং প্রতিবাদ কেই তিনি তুলে ধরেন। মহাশ্বেতার ছোটগল্পে বর্ণিত নিম্ন শ্রেণির নারী চরিত্ররা তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের কাছে কখনো শোষিত ও নির্যাতিত হতে দেখা যায় না। কেননা আদিবাসী সমাজে নারী পুরুষ সম মর্যাদা সম্পন্ন। যার ফলে এদের মধ্যে নারী পুরুষের বৈষম্য গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এই অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষেরা সর্বদাই প্রতিবাদ করে তাদের সমাজের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে। জমিদার, মহাজন ও সরকারী দমন পীড়ন নীতির বিরুদ্ধে। আর এই প্রতিবাদে নিম্ন শ্রেণির শুধুমাত্র পুরুষেরাই নয় নারীরাও এগিয়ে আসে পুরুষের সঙ্গে হাতে হাত ও পায়ে পা মিলিয়ে। তবে নারীরা একই সঙ্গে দুভাবে শোষিত ও নির্যাতীত হয়। প্রথমত তারা শোষিত হয় তাদের শ্রেণিগত বর্গীয়করণের জন্য। আবার নারী হওয়ার জন্যও তারা নির্যাতীত ও ধর্ষিত হয়। তবে মহাশ্বেতার বর্ণিত নারীরা শুধু নির্যাতন সহ্যই করেনা সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদও জানায়। কখনও অসহায়তাকেই প্রতিবাদের হাতিয়ার বানায় আবার কখনও অস্ত্র হাতে লড়াই করে অপরাধের ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে। সামাজিক রাজনৈতিক প্রতাপের বিরুদ্ধেও পুরুষদের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে আন্দোলনে নেমে পড়ে। সমাজের সমস্ত সমস্যা, অভাব, খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রীর যোগানও সৃষ্টি করে। কখনো কখনো আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত নারীরা নিজের প্রতি হওয়া অন্যায় অত্যাচারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র প্রতিবাদ করেই থেমে থাকে না। সংঘাতও তৈরি করে নির্যাতন ও অপমানের বিরুদ্ধে।

নকশাল বাড়ি আন্দোলনের প্রেক্ষিত এবং সাধারণ আদিবাসী অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের কথা মাথায় রেখে মহাশ্বেতা 'দ্রৌপদী' গল্পটি রচনা করেন। এই গল্পের মূল চরিত্র দ্রৌপদী ও দুলনও নকশাল পার্টির কর্মী। ১৯৬৭ সালের নকশাল বাড়ির জ্বলে ওঠা আগুনের প্রেক্ষিতে আদিবাসী সমাজও জেগে ওঠে এই জেগে ওঠা আন্দোলন ও প্রতিবাদ এবং সংঘাতই 'দ্রৌপদী' গল্পের মূল বিষয় বস্তু। গল্পের শুরুতেই সরকারী ঘোষণা,-

> "নাম দ্রৌপদী মেঝেন, বয়স সাতাশ, স্বামী দুলন মাঝি(নিহত), নিবাস চেরাখান, থানা বাঁকরা ঝাঁর, কাঁধেক্ষত চিহ্ন (দ্রৌপদী গুলি খেয়েছিল), জীবিত বা মৃত সন্ধানদিতে পারলে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারের সহায়তায় একশত টাকা.....।"[২]

ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য যে আন্দোলন করা হয় সেই আন্দোলন করার অপরাধেই এই ওয়ান্টেড নোটিশ। জাতি–ধর্ম-বর্ণ-বৈষম্য-নির্বিশেষে ভারতীয় নাগরিক সমমর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার মৌলিক অধিকার। কিন্তু নিম্নশ্রেণির আদিবাসী ও সাঁওতাল সমাজের মানুষদের উচ্চ শ্রেণির জমিদার, জোতদার, মহাজন শ্রেণির মানুষেরা এই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। উচ্চ শ্রেণির মানুষের ইঁদারা, টিউবওয়েল থেকে পান কারার জল নিতে দিত না। খাদ্য–অন্ন-বস্ত্র, অরণ্য জঙ্গল প্রভৃতির অধিকার গুলি থেকে আদিবাসীদের বঞ্চিত করা হয়। তাইতো এই শ্রেণির মানুষ আন্দোলন করে নিজের অধিকারের জন্য জমিদারের বিরুদ্ধে। এই আন্দোলন করতে গিয়েই দ্রৌপদীরা ওয়ান্টেড লিস্টের মধ্যে পড়ে যায়, গল্পেও এর মূল কারণ বর্ণিত রয়েছে,

> "১৯৭১ সালে বিখ্যাত অপারেশন বাকুলিতে যখন তিনটিগ্রাম হেভি কর্ডন করে মেশিনগান করা হয় তখন এরাদুজনও নিহতের ভান করে পরে থাকে। বস্তুত এরাইমেইন ক্রিমিনাল। সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন, ড্রাউটেরসময়ে আপার কাস্টের ইঁদারা ও টিউব ওয়েল দখল,সবেতেই এরা

> মেইন, ...ভারতের সংবিধানে জাত ধম্মো নির্বিশেষে সকল মানুষইপবিত্র, তার সত্ত্বেও এহেন অঘটন ঘটে যায়। কারণদ্বিবিধ : এক, নিখোঁজ দম্পতির আত্ম গুপ্তিতে অসামান্যদক্ষতা। দুই, বিশেষ বাহিনীর চোখে সাঁওতাল বোন,অষ্ট ও এসিয়াটিক মুণ্ডা গোষ্ঠীর সকল সন্তানকেই এক চেহারামনে হওয়া।”[৩]

দ্রৌপদী ও দুলন দের মতো মানুষদের সুখ স্বাচ্ছন্দ বলে কিছু থাকে না। এদের কোন উচ্চাশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। টাঙি, হেঁসো, তীর, ধনুক, খন্তা, কোদালই এদের একমাত্র সম্বল। বন জঙ্গল অরণ্য এদের মা। এই অরণ্য থেকেই এরা এদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সমুহ সংগ্রহ করে। তাইতো বেঁচে থাকার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জল টুকু শুধুমাত্র এদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু যখন এই জল টুকু দানেও বাঁধা প্রাপ্ত হয় তখনই এরা বুঝতে পারে জটিল রাজনৈতিক সমাজের হাত থেকে কিছু নিতে গেলে ছিনিয়ে নিতে হবে। আর এই ছিনিয়ে নেওয়ার দাঙ্গায় সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন করে দ্রৌপদী ও দুলনরা।

এরা ফেরার হয়ে যায় বাকুলি ছেড়ে স্থানে স্থানে জঙ্গলে ঝাঁরে আত্ম গোপন করে। ঝর্ণার জলে জল খেতে গিয়ে দুলন তিনশ তিনের আঘাতে প্রাণ হারায়। কিন্তু সে সময় দ্রৌপদীকে ধরতে পারে না। কিন্তু পরবর্তীতে দ্রৌপদী ধরা পরে দুখিরাম ঘোড়ারীর সহযোগিতায়। দুখিরামের সাহায্যে দুলনকে কাউন্টার করে এবং দ্রৌপদীকেও ধরে। সাঁওতাল আদিবাসী সমাজের মানুষেরা একে অপরের সঙ্গে কখনো হারামি করে না। যদিও বা দুই একটা কাজ করে তবে পেটের জন্য যা নিম্ন শ্রেণির মানুষের একটা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তাইতো সোমাইকে, দুখিরামকে দ্রৌপদী দায়ি করে না। সে মনে মনে ভাবে,-

> “সোমাই ও বুধনা জারজ। যুদ্ধের ফসল। শিয়নডাঙার মার্কিন সৈন্যদের উপহার টুওআর্ডজ রাঢ় ভূমি।নইলে কাক

> যদি বা কাকের মাংস খায়, সাঁওতাল সাঁওতালকে ধরাতে হারামি করে না।”[৪]

ক্যাপ্টেন অর্জুন সিং দ্রৌপদী ও দুলনের আত্ম গোপন কারী দুর্ভেদ্য জঙ্গলকে তারা সেনাদিয়ে ঘিরে ফেলে। দুলন মারা গেলেও অপারেশন থামে না। সন্ধ্যা ছটা সাতান্নতে দ্রৌপদী ধরা পরে। আটটা সাতান্নতে সেনা নায়কের ডিনার টাইম হয় এবং দ্রৌপদীকে বানিয়ে আনতে বলে, ‘ওকে বানিয়ে নিওয়ে এস। ডু দি নীডফুল।’ তারপর সারা রাত ধরে চলে বানিয়ে নেওয়ার পালা,

> “ঘোলাটে চাঁদের আলোয় বিবর্ণ চোখ নিচের দিকে নামাতেনিজের স্তন দুটি চোখে পরে এবং বুঝে হ্যাঁ, ওকে ঠিক মতো বানানো হয়েছে। এবার ওকে সেনা নায়কের পছন্দহবে। স্তন দুটি কামড়ে ক্ষত বিক্ষত, বৃন্ত ছিন্নভিন্ন। কত জন ? চার –পাঁচ–ছয়–সাত তারপর দ্রৌপদীর হুসছিল না।..... ঘার ঘোড়ায় ও বেয়নেটে ভর দিয়ে দাঁড়ানো সান্ত্রী ওকেদেখে ও হাসে। চোখ বোঁঝে দ্রোপদী। অপেক্ষা করতেহয় না বেশিক্ষণ আবার বানিয়ে নেবার প্রক্রিয়া শুরু হবে।চলতে থাকে। চাঁদ কিছু জ্যোস্না বমি করে ঘুমাতে যায়।থাকে শুধু অন্ধকার। একটি বাধ্য হয়ে পা ফাঁক করেচিতিয়ে থাকা নিশ্চল দেহ। তার উপর সক্রিয় মাংসেরপিস্টন ওঠে ও নামে, ওঠে নামে।”[৫]

নামের দিক থেকে মহাভারতের দ্রৌপদীর সঙ্গে আলোচ্য গল্পের দ্রোপদির মিল রয়েছে। নির্যাতনের দিক থেকে এ গল্পে দ্রৌপদী হয় ধর্ষিত কিন্তু মহাভারতের দ্রৌপদীর শরীরে পুরুষের আঁচ লাগলেও পুরুষের দৃষ্টির সামনে তাকে বিবস্ত্রা করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পায় তা সম্ভব হয়নি। আবার মহাভারতের দ্রৌপদীর অপমানের

প্রতিশোধ নেয় ভীম দুঃশাসনের উড়ু ভঙ্গ করে। কিন্তু আলোচ্য গল্পে দ্রৌপদীর নির্যাতনের প্রতিশোধ নেওয়ার মতো কোন বীর পুরুষ জন্ম নেয়নি কলি যুগে। তাইতো দ্রৌপদীকে তার এই অপমানের প্রতিশোধ তাকে নিজেকেই নিতে হয়।

> "দ্রৌপদী সেনা নায়কের সামনে এসে দ্বারায়। উলঙ্গ উড়ু ও যনি কেশে চাপ চাপ রক্ত। স্তন দুটি ক্ষতবিক্ষত।..... দ্রৌপদী আরও কাছে আসে। কোমড়ে হাত রেখে দাঁড়ায়, হাসে ও বলে, তুর সাধানের মানুষ, দোপদি মেঝেন। বানিয়ে আনতে বল্যেছিলি, তা কেমন বাঁনিয়েছে দেখবি না?
>
> দ্রৌপদীর কালো শরীর আরও কাছে আসে। দ্রৌপদী দুর্বোধ্য, সেনা নায়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাপে। হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোট থেকে রক্ত ঝড়ে এবং সে রক্ত হাতের চেটতে মুছে ফেলে দ্রৌপদী কুলকুলি দেবার মতো ভীষণ, আকাশ চেরা, তীক্ষ্ণ গলায় বলে, কাপড় কি হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পড়াবি কেমন করে? মরদ তু?
>
> চারি দিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্ত মাখা থুথু ফেলতে সেনা নায়কের সাদা বুশ সার্টটি বেঁছে নেয় এবং সেখানে থুথু ফেলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পড়াতে দিব না। আর কি করবি ? লে : কাউটার কর, লে কাউটার কর?"[৬]

গল্পে দ্রৌপদী নির্যাতীত ও ধর্ষিত এক বিদ্রোহী নারী চরিত্র। ভারতবর্ষের প্রশাসন ক্ষমতার অপব্যবহারের স্বরূপ দ্রৌপদী ধর্ষিত ও উলঙ্গ। কিন্তু শুধু দ্রোপদীর ঘটনা বলার জন্য মহাশ্বেতা বোধহয় শুধুমাত্র এই অভিপ্রায়ে কাহিনি রচনা করেন নি। কেননা রাষ্ট্র শক্তির হাতে একজন সাধারন অসহায় নারীর উলঙ্গ হওয়ার সাথে সাথে গোটা ভারতবর্ষ

তথা ভারত মাতা অভ্যর্থনায় যে রাষ্ট্রকে সেলাম জানানো হয় তাকেও উলঙ্গ করা হয় কেননা সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে উঠে আসে দ্রৌপদীর কাহিনি।

তাছাড়া একজন নারী যখন অবর্ণনীয়ভাবে নির্যাতীত হয়, ধর্ষিত হয় তখন একজন ভারতীয় রমণীর আর কিছু বাকি থাকেনা। এবং গোপনে বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন টুকু শেষ হয়ে যায়। তাই দ্রৌপদীর শেষতম প্রতিবাদ এবং ঘৃণা ভরা থুথু পড়ে রাষ্ট্র শক্তির প্রতীক য়ুনিকর্মের উপর। এবং দ্রৌপদীর আচরণ ও ভাষা শুধু প্রতিবাদ করেই যেন থেমে থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে সংঘাতও করে রাষ্ট্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এই সংঘাতের মুখোমুখি দাঁড়াতে দেশের শাসক সৈনিকের প্রধানও মুখোমুখি দাঁড়ানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। 'এই প্রথম সেনা নায়ক নিরস্ত্র তার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।' এখানে একজন সেনার সর্বোপ্রকার বীরত্ব শক্তি মূর্ছিত হয়ে ভীরুতা ও কাপুরুষতাকেই প্রকাশ করে।

> "মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন বীরসা মুন্ডার কাহিনি– 'অরণ্যের অধিকার'। সেই অধিকার অরণ্য ছাড়িয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামে বিস্তৃতি পায় 'দ্রৌপদী' গল্পে। .....বাকুলির ঘটনা (জোতদার সূর্য সাউ ফুল) সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপট অর্জন করেছে। মানুষ জনের শিবির বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই পটভূমিকায়লিখিত হচ্ছে দ্রৌপদীর কাহিনি কিংবা অন্য এককুরুক্ষেত্রের প্রস্তাবনা।"[৭]

এটাই স্বাভাবিক যে অন্যায় থাকবে, অত্যাচার থাকবে অথচ প্রতিবাদ থাকবেনা, আন্দোলন হবে না তা কখনো হয় না। তাইতো দ্রৌপদীর অন্ত:সত্তায় জেগে ওঠে অরিজিতের কথা,-'যখন জিতছ, তা যেমন জানবে, যখন হারলে, তা মানবে এবং পরের স্টেজ থেকে কাজ করবে।'[৮] কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে ততদিন যতদিন ওয়েল অ্যাকশন থাকবে, মহাজন জোতদার – গোলদার শুঁড়ি – বেশ্যালয়ের বেনামী মালিক, অতীতের খোঁচররা থাকবে। মহাশ্বেতাও সে কথা বলেছেন,

> "যে মাটিতে থাকছে তার সঙ্গে হয়তো কেতাবি শিক্ষা ওরিয়েন্টেশন করে নতুন করে সংগ্রাম পদ্ধতি ও বাঁচবারনিয়ম শিখছে। বাইরের কেতাবি শিক্ষা ও অন্তরের উদ্যমএইমাত্র যাদের সম্বল, তাদের গুলি করে নিকেশ করাচলা। হাতে কলমে কাজ করছে যারা, তারা অত সহজেনিকেশ হবার নয়।"[৯]

প্রকৃত পক্ষে মহাশ্বেতা দেবীর সারা জাগানো গল্প 'দ্রৌপদী'র মধ্যদিয়ে যেমন আদিবাসী সমাজের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে তেমনি নির্যাতীত ও ধর্ষিত অসহায় নারীর প্রতিবাদ জনিত সংঘাতও উঠে এসেছে। যেখানে মুক্তির স্বরূপ ফাল্গু নদীর স্রোত ধারার মতো শত সহস্র বালুকা রাশির মধ্যদিয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়েছে। তাইতো মহাশ্বেতা পরের স্টেজের কথা বলেছেন। অর্থাৎ সেই স্টেজের মধ্যদিয়ে পৃথিবী একদিন সর্বপ্রকারসামাজিক, রাজনৈতিক এবং অন্যায় অত্যাচার মুক্ত হবে। স্বাধীন ভারতের নাগরিক স্বাধীন ভাবে নি:শ্বাস গ্রহণ করবে। যেখানে উচ্চ মধ্য নিম্ন শ্রেণি বলে কোন সমাজ থাকবে না। পাশাপাশি সর্বোপ্রকার সাংস্কৃতিক রাজনীতির হাত থেকে মুক্তি পাবে নারী সমাজ। যেখানে অন্যায় – অত্যাচার – ধর্ষণ – নির্যাতন থাকবে না, এই স্বপ্ন রাজ্যে নির্মাণের প্রচেষ্টায় মহাশ্বেতার 'দ্রৌপদী'র প্রতিবাদ শুধুমাত্র সমসাময়িক সময়েই সীমাবদ্ধ থাকবে না। পাশাপাশি পরবর্তী শত শত বছরেও অক্ষয় ও অমর হয়ে থাকবে পাঠক বর্গের হৃদয়ের মনি কোঠায়।

‘শনিচরী’

‘শনিচরী’ গল্পেও মহাশ্বেতা আদিবাসী অনগ্রসর সম্প্রদায়ের অভাব অনাহার ক্লিষ্ট এক নারীর জীবন বিত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। ঠক, জোচ্চোর, দালালের খপ্পরে পরে একজন নারী কীভাবে দিনের পর দিন ধর্ষিত হয় সে কাহিনিই তুলে ধরেছেন। মেয়ে পাচার কারীর একজন অন্যতম সদস্য গোহুমনি যার নি:শ্বাসে বিষ। গোহুমন বিবি গ্রামে গ্রামে ঘুরে অভাব অনাহারে জীবন যাপনকারী অন্ত্যজ শ্রেণির পরিবারের মেয়ে গুলিকে নিয়ে যায় কলকাতার নাম করে। তারপর কাউকে বিক্রি করে দেয়, রেন্ডি বানায় আবার কাউকে ইটভাটার চার দেওয়ালের প্রাচীরে চির বন্দি করে রাখে। শনিচরী হিরা লালের কাছে জানতে পারে গোহুমন বিবির ব্যবসার কথা। এবং শনিচরী এই গোহুমন বিবিকে এড়িয়ে চলে। কারণ এরা জানে,

> “কলকাতা শহর একটা রাক্ষস। রাঁচি-সিং ভূম-পালামৌ এসব জায়গার কাচা মেয়ে নেয়। কাউকে রেন্ডিকরে দেয়, কাউকে বেঁচে দেয়!”[১০]

কিন্তু রহস্যময় নিয়তি বিমুখ থাকে এদের প্রতি তাইতো একদিকে দেখা দেয় খরা-অনাবৃষ্টি, অন্যদিকে রাজনৈতিক দাঙ্গা। একদিকে ‘আদিজাতি রক্ষা মোর্চা’র লড়াই অন্যদিকে জঙ্গলের আগুন দুটোই হাহা করে ধেয়ে আসে। এই আদিম অনগ্রসর দরিদ্র সম্প্রদায়ের

দিকে। একদিকে চলতে থাকে পুলিশ মিলিটারির গুলি অপরদিকে ছুটতে থাকে তীর, রাতা অঞ্চলের এই উত্তাল অস্থিরতার ও মৃত্যুর কথা মহাশ্বেতা বর্ণনা করেছেন এভাবে,

> "খুব একটা হট্টোগল হয়। মানুষ গুলি বেমক্কা গুলি এড়াতে ছুটে যায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দিকে। মিলিটারি পুলিশসেই ছোট্ট হাসপাতালে ঢুকেই গুলি চালায়। আর ট্রাকএনে লাশ সরানো হয়। সিধা যাও মার্টন গঞ্জ কারখানায়। চুল্লিতে লাশ ফেল। সবলাশ সরাও। হাস পাতালে এগারোটা লার্শ থাকুক। কাগজকে খবর দেবার সময়ে এগারোটা লাশের কথা বলা যাবে।"[১১]

এভাবেই নকশাল আর ঝাড়খণ্ডের রাতা হয়ে ওঠে খবরের কাগজের খবর। কিন্তু এই খবরও হয় পুলিশ মিলিটারির ইচ্ছার উপরেই। কেন্দ্রের ও রাজ্যের মন্ত্রীরা এই বি. এম. পি. পুলিশ প্রশাসনের উপরই দায়িত্ব দেয়। যার ফলে রাতা হয়ে ওঠে সরকারি সংরক্ষিত এলাকা। আর এই সংরক্ষণ যে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তা মহাশ্বেতা নিজেই বর্ণনা করেছেন,-

> "রাতা গ্রামে আর তামাম এলাকায় সেই যে পুলিশ আর বি.এম. পি. ঢুকে গেল, তাদের তাণ্ডব তো থামল না। যানুমসিং লিখল গ্রামে গ্রামে বি. এম. পি., সি. আর. পি., বি.এস. এফ., কোমবিং করে জুলুম চালিয়েছে, হত্যা, লুণ্ঠন,মকাই ধান, শস্যভরা ক্ষেত সব নষ্ট করে দিয়েছে।পাশবিক অত্যাচার মুরগি ছাগল কেটে খেয়েছে। লাঙল সবভেঙে দিয়েছে। যা কিছু সম্পত্তি, হাঁড়িকুঁড়ি, কাঠের ঘর ভেঙে চুরমার করে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। আদিবাসীরা ঘরহারা হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। আদিবাসীদের খাবার লবন, চাল নাই। কাপড় চোপড় নাই। জঙ্গলে পাহাড়েরগুহায়

> তাদের আশ্রয়। পরিবার সহ ছিন্নভিন্ন হয়ে কে কোথায় চলে গেছে তার ঠিকানা নাই।”[১২]

অন্ন বস্ত্রহীন ভাবে জঙ্গলে কাটতে থাকে এই রাতা অঞ্চলের মানুষের জীবন। এই মানুষ গুলোর বস্ত্র বাসস্থান সবই জ্বলে পুঁড়ে ছাই হয়ে গেছে। ফলে জোয়ান – যুবতি মেয়েদের লজ্জা নিবারণের জন্য শেষ সম্বল বলে আর কিছুই রইল না। অপরদিকে জঙ্গলে জোয়ান মেয়েদের নিয়ে বি. এম. পি.র বেইজ্জত ও নির্যাতনের চেষ্টা। কাপড়ের অভাবে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার মতো উপায়ান্তর নেই। তাইতো জঙ্গলেই নির্যাতীত জীবন নিয়েই এই সাঁওতাল আদিবাসী মেয়েরা বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সে স্বপ্ন বেশিদিন টেকে না। গোহুমনের প্রত্যয় ও স্বপ্নের গন্ধমাখা হাজার হাজার প্রতিশ্রুতির কাছে। কূলকিনারা হীন সংকটময় প্রতিশ্রুতির কাছে শনিচরীরা গোহুমনের সঙ্গে যেতে বাধ্য হয়, কেননা, ‘বনের কন্দমূল খেয়ে নয় খিদে মিটলো কিন্তু লজ্জা ঢাকার কাপড় তো জঙ্গল দিতে পারে না। তাইতো শনিচরী গোহুমনের ছোবল খেল।’[১৩] এভাবেই শনিচরীরা দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে গোহুমনির মতো মানুষের খপ্পরে পড়ে যায়। রাতের অন্ধকারে শনিচরী রাতা অঞ্চলের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে নিজেও চলে আসে রহমত খাঁর ইটভাটায়। আর এখানে এসেই বুঝতে পারে নিম্নশ্রেণির মানুষের ঘরে জন্ম গ্রহণ করা কতটা পাপ। ইটভাটার শাসন ব্যবস্থা বি. এম. পি’র থেকেও ভয়ঙ্কর। এদের কাছে উভয়ই সংকট ‘জলে কুম্ভীর আর ডাঙ্গায় বাঘ’ কোন দিকে যাবে শনিচরীর দল ? তাইতো প্রতি নিয়ত হতে থাকে নির্যাতীত ও ধর্ষিত। শনিচরী রহমতের নজরে পরে যায়,

> “রহমত শনিচরীর হাত চেপে ধরেছিল। বলেছিল চল চল।আমার সঙ্গে মাংস ভাত খাবি। তোকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এরকম মরিচ ঝাল মেয়ে না হলে সুখ হয়?”[১৪]

রূপ সৌন্দর্য, যৌবন শনিচরীকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে কারণ সে তার শরীরের বিনিময়ে ছিল শুধুমাত্র রহমতের। কিন্তু তার সঙ্গিনীরা জসিমা, লুগরি, ঝিনি, পারাই,

ফুলমনি এরা একই সঙ্গে দু রকমের মার খেয়েছে দিন এবং রাতে। সারাদিন ইটভাটার কাজ করার পর শরীর যখন ক্লান্তিতে অবসরে অবসন্ন হয়ে যায়, ‘ তখন তাদের নিয়ে নিলামে ডাকে হেড মাস্তান। আজ তুমি তার, কাল ড্রাইভারের, পরশু মুন্সির। .....হোলির দিনে তাদের চোখে নামে আতঙ্ক। কলকাতা থেকে আসে ভাটা মালিকের বন্ধু বান্ধব মদ খাইয়ে বেহুশ করায় কাপড় খুলে নেয়। তারপর যে কি হয় তা শরীর জানতে পারে।’[১৫]

এই দিক থেকে শনিচরীর শরীরের প্রতি নির্যাতন তুলনা মূলকভাবে অন্যান্য মেয়েদের থেকে কমই হয়েছে। কিন্তু শনিচরীর প্রতি নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে ওঠে পরবর্তী সময়ে। যখন সে বমি করে। তার গর্ভে যখন রহমতের সন্তান আসে। গোটা পৃথিবী তার কাছে অন্ধকার হয়ে যায়। শনিচরী রহমতের কাছে হয় বিতাড়িত। রহমত জানায়, ‘কাল থেকে রেজা খাটবি। জসিন এখানে থাকবে। রেজা খাটবি টিকলি নিবি।’ শনিচরীর রূপ যৌবন এবং যতদিন ভোগের উপযোগী ছিল ততদিন ছিল রহমতের। যখন সন্তান সম্ভবা হয় শনিচরীর যৌবন ফেকাসে হয় তার মুখ ও শরীর, তখন আর তার প্রয়োজন নেই। এ কথা শনিচরী ভারতে পারেনি। কিন্তু এটাই হয় সব শ্রেণির স্বার্থপর পুরুষের কাছে মেয়েরা ভোগ্যপনণ্য হিসেবেই থেকে যায়। অপরদিকে শনিচরী রহমতের সন্তানকে নিয়ে পরে যায় বিপাকে। সমাজ তাকে বিতাড়িত করে দিকুর সন্তান গর্ভে ধারণ করার জন্য। রহমত ও সমাজ শনিচরীকে ছেরে দিলেও শনিচরী নিজের গর্ভে থাকা সন্তান কে ছাড়তে পারে না। তার মাতৃ হৃদয় রহমতের সন্তানকে আষ্টেপিষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। ফলে শনিচরীর প্রায়শ্চিত্ত হয়, ভোজ দেয় তবু সমাজ তাকে আপন করে নেয় না। সমাজ তাকে বের করে দেয়। শনিচরী এবার নিজে ঘর বানায়, নিজে রাঁধে খায়। অথচ সমাজকে দায়ি করেনা, আবার গোহুমন বিবিকেও দায়ি করেনা। তাদের সমাজের মেয়েদের করুন পরিনতির জন্য দায়ি কে হিরালালকে বলতে গিয়ে শনিচরী জানায়,

> “শনিচরী হাসল। সান্তনা দিয়ে বলল, গোহুমন বিবিও কিন্তু আসল গোহুমন নয়। সে কথাটা তুমি জানতে না। আমি জেনে এসেছি। ..... এই সব কিছু, স-ব! বলে হাত

> ছড়িয়ে দিয়ে শনিচরীসমগ্র বিশ্ব ভূবন দেখিয়ে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।”[১৬]

নারী হয়ে জন্ম গ্রহণ করায় তার উপর বর্তায় একই সঙ্গে সামাজিক রাজনৈতিক শোষণ, নিপীড়ন। আবার পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ক্ষমতার প্রভাবে শনিচরী একই সঙ্গে হয় লাঞ্ছিত। এই শনিচরী শুধু একা নয় আরও শত শহস্র শনিচরীরা রয়েছে সমাজে যারা শোষিত নির্যাতীত এবং ধর্ষিত হয়ে। এদের কোন বিচার হয় না। এরা কোন সুফল পায় না। শনিচরীর মধ্যদিয়ে মহাশ্বেতা গোটা ভারতবর্ষের নারী নির্যাতনের দিকটিকে তুলে ধরেছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন গপটা ভারতবর্ষের মূল চেহাড়াটাকে। তাইতো শনিচরী তার নিজের উপর হওয়া অন্যায় অত্যাচারের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ নিজে করতে না পারলেও লেখিকা সেই প্রতিবাদকে নিজের মাথায় তুলে নেন। নিজেই হয়ে ওঠেন গল্পের চরিত্র। একারণেই তিনি নিজেই শনিচরীর হয়ে বলেন,

> “আমি জানি, শনিচরী দেখিয়ে দিচ্ছে কে বা কারা আসলগোহুমন। আমি একথাও জানি যে শনিচরী অপেক্ষা করছে। শুধু জানিনা, কবে তার অপেক্ষা ফুরাবে। শনিচরীর কাহিনি তোফুরায় নি। যতদিন রহমত নির্বিঘ্নে ভাটা চালাবে, যতদিন গোহুমন শনিচরীদের ছোবল দিবে, যতদিন মাতৃভূমি শনিচরীদেরভাত কাপড় দিবে না, ততদিন শনিচরীর ঐ হাত ছড়িয়েআঙুল দেখাবার স্থির চিত্র ভাঙবে না।”[১৭]

বুঝতে অসুবিধা হয় না, যে লেখক স্বর এখানে রাজনৈতিক প্রতাপের প্রকৃত দিককেই কটাক্ষ করেছেন। সঙ্গে রহমতের মতো ব্যবসায়ি মালিকদের আসল চেহারাটিও সূক্ষ্ম স্থির ইঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। মহাশ্বেতা শুধুমাত্র এই রাজনৈতিক চিত্র, রহমতের মতো উচ্চ শ্রেণির লাম্পট্য ব্যবসায়ির কথা বলেই থেমে থাকেন নি। ভারতের প্রশাসনিক শক্তির

ঘুষখোর চরিত্র এবং যথাযথ দায়িত্ব পালন না করার দিকটিকেও তুলোধনা করে ছেড়ে দেন,

> "থানা পুলিশ টাকা খেল। জি. আর. পি. টাকা খেল। আরও যারা গোহুমনের হাতের টাকা খেয়ে হাজার হাজার মেয়ে পাচারের ব্যাপারে 'কিছু দেখছি না। কিছু জানছি না।' বলে চুপ করে রইল, তাদের পরিচয় আমি দিতে পারব না। তবে একথা হাজার বার বলব যে, যদি এই শেষের লোক গুলো বাঁধা দিত তাহলে মেয়ে গুলো এমন করে দরিয়ায় ভেঁসে যেত না।"[১৮]

এটাই মহাশ্বেতার মূল চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য আবার সমাজকে সুধরে নেওয়ার ও গোটা সমাজের নারী সম্প্রদায়কে চির বন্ধন থেকে মুক্তি করার আপ্রান প্রয়াস।

‘দৌলতি’

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৯২/জুন ১৯৮৫ খ্রি:

‘দৌলতি’ গল্পে মহাশ্বেতা কামিয়ৌতি প্রথার প্রেক্ষিতে নাগেসিয়া সমাজের মানুষদের এবং এই সমাজে বসবাসকারী নারী সমাজকে শোষণ ও নির্যাতনের দিকটি তুলে ধরেন। এই গল্পেও পরিলক্ষিত হয় ‘Voiceless section of Indian society’র কথা। স্বাধীন ভারতে বসবাসকারী মানুষের বর্ণ বৈষম্যগত, শোষণ - নির্যাতন, শাসন এবং ধর্ষণ এইসব বিষয়ই দৌলতি গল্পে দেখানো হয়েছে। উচ্চ শ্রেণির মালিক মহাজন জোতদারদের দাদন, ঋণ দিয়ে অন্ত্যজ শ্রেণির হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষদের দাসত্বে পরিণত করে, এই ব্যবস্থাও উচ্চ আভিজাত্য মানুষদের এক সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির হাত থেকে মুক্তি হীন অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের পরিচয় হয় মালিক বা প্রভুর বাড়ির শ্রমিকের শ্রম দান করার ভিত্তিতে, যেমন – কমিয়া . সেওকিয়া, বেঠবেগার প্রভৃতি। ‘দৌলতি’ গল্পের প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা রচনা সমগ্রের ১৩তম খণ্ডে ভূমিকার পরিবর্তে অংশটিতে বলতে গিয়ে বলেছেন,-

> “কাহিনির উৎস ১৯৮০র দশকে, যখন আমি বন্ডেড লেবার বা ঋণবদ্ধ দাস মজুর প্রথার কথা জানি, পালামৌয়ে তা

দেখে সংগঠন ও প্রতিবাদের ব্যাপারে জড়িয়ে পরি। সে সময়ে ঐ প্রথা সংক্রান্ত তথ্য জোগাড় করতাম আমি ও মৈত্রেয় ঘটক। বস্তুত আমি জানতাম না, পরে জানলাম, ১৯৮০ সালে আমি ডালটন গঞ্জ যাওয়ার এক বছর আগেই মৈত্রেয় (তখন দিল্লিতে থাকত) আর ওর বন্ধু বিজু (টি বিজয়েন্দ্র) কেন্দ্রিয় সরকারের একটি সংস্থা থেকে সমীক্ষা করতে গিয়েছিল, 'দাস মজুর প্রথা নিষিদ্ধ করণ আইন' ১৯৭৬এ পাশ হবার পর বাস্তবে তা কার্যকরি হয়েছে কিনা। তা হয়নি। তবে সে সময়ে দিল্লিতে মৈত্রেয়, কলকাতায় আমি তথ্য পরিসংখ্যান জোগাড় করেই যাচ্ছি। এই প্রেক্ষিতেই ন্যাশনাল লেবার ইন্সটিটিউটের বুলেটিন এবং গান্ধি পিস ফাউন্ডেশনের রিপোর্ট জোগার করতাম ভাই আর বোন। 'দৌলতি' কাহিনি পেয়েছিলাম ঐ দুই জার্নালের কোন টিতেই মূল ঘটনায় ঐ ঋণবদ্ধ মেয়েটির শরীর ব্যবহার করে ঋণের টাকা তোলার রীতি তখন ছিল হিমালয়ের পাদদেশে জৌনসার বাওয়ার অঞ্চলে। সে অর্থে ঐ যৌনতার শিকার করে ফেলার কাহিনি সর্বৈব সত্য। পালামৌয়ের পটভূমি এখানে ভারতের ক্ষেত্রেও সমার্থক। বলা বাহুল্য, ২০০৩ সালেও প্রথাটি ভারতে রয়ে গেছে, দাস প্রথা কবে ছিল না ? আদিতেও ছিল, অন্ত তো হয় নি।" [ঐ, পৃষ্ঠা-৯]

একবার যদি কোন হরিজন শ্রেণির মানুষ এই ঋণ গ্রহণ করে তবে সারা জীবনেও তা পরিশোধ করতে পারেনা। এই ঋণের সুদের পরিমান এত বেশি যে, যে ঋণ গ্রহণ করে পরবর্তী সময়ে তার বংশানুক্রমে সকল প্রজন্মকেই ঐ একই সূত্রে বেগার খাটতে হয়, কামিয়তি থাকতে হয়। আবার যদি কেউ এই ঋণ গ্রহণ করতে না চায় তবে জমিদার – জোতদার বলপূর্বক তাকে ঋণ গ্রহণে বাধ্য করে। যার ফলে এলাকার সকলই হয়ে ওঠে

মালিকের অধীনস্থ কর্মচারী। এই মালিকের অনুমতি ছারা এলাকায় কেউ ঘর বাড়ি বানাতে পারে না। এই সেওরা গ্রামের একমাত্র অধিপতি মুনাবর সিং চন্দেলা। সে যে কতজন দুসাদ, ঘাসি, নাগেসিয়া, মুন্ডা লোহার, ওঁরাও, ভুঁইয়া, চামার, পারহাইয়াকে কামিয়া করে রেখেছে সে নিজেও জানে না। তাইতো কামিয়া বুড়িরা এই কামিয়া প্রথাকে নিয়ে গান রচনা করে,

"ঋণের জোরে, ঋণের জোরে।
দুই টাকা দশ টাকা একশ টাকা
দশ শের গম পাঁচ শের চাল
ধার দেয় মুনাবর আমাদের ...
আমাদের বুড়া আঙুলে কালি মাখায়
সাদা কাগজে ছাপ নিয়ে নেয়
কাগজটা তুলে রাখে সিন্দুকে ...
ঋণের জোরে ও মহারাজ।
ঋণের জোরে ও সরকার।
মন্ত্রী চলে আসে সেওরা গ্রামে
ঋণ দিয়ে ও সরকার বনে গেছে
আর আমরা বনে গেছি কামিয়া
আমাদের আর মুক্তি নেই।"[১৯]

কামিয়া হয়ে যাওয়াটা এদের কাছে বিধির বিধান। নাগেসিয়া সম্প্রদায়ের পুরুষেরা শুধুমাত্র শরীরের শ্রম দিয়ে দুখ কষ্টে জীবন যাপন করে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু এই সম্প্রদায় ভুক্ত মেয়েদের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে দু রকম কাজ করতে হয়। দিনভর কাজ করা আর রাতের অবসরে মলিন্দর সিংদের মতো মহাজনদের দ্বারা নির্যাতিত হওয়া। কোন কোন যুবতি সুন্দরি মেয়েকে পরিপূর্ণ ভাবে দেহ ব্যবসায় নামতে হয় কামিয়তির জালে আবদ্ধ হয়ে। দৌলতি এই জালে ফেঁসে যাওয়া নাগেসিয়া সম্প্রদায়ের অল্প বয়স্ক একজন সুন্দরী যুবতি মেয়ে। কামিয়তির জালে ফেঁসে গিয়ে কীভাবে পতিতাবৃত্তিতে নেমে আসে জমিদার –

জোতদার – মহাজন ও উচ্চ পদস্থ ব্রাহ্মনদের চাপে সে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে দৌলতি গল্পে।

গনোরি নাগেসিয়ার মেয়ে দৌলতি গনোরি মলিন্দর সিং এর কামিয়তি। মকাই ছাতু, কুরথি কালাই ঘাটো খেয়ে খেয়ে দু:খে কষ্টে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে মালিকের বাড়িতে কাজ করতে করতে। গনোরি নাগেসিয়া তিনশ টাকার বিনিময়ে মলিন্দরের কাছে কামিয়তিতে আবদ্ধ হয়েছে। আর এই ফল স্বরূপ গাধার মতো খাটতে হয় গনোরিকে, একদিন খেপে গিয়ে মলিন্দর বলে,

> "বলদ গেল তো তুই বোঝাই কর গাড়ি। নে কাঁধে জোয়াল,উঠা, উঠা। টান গাড়ি। একটা বলদের দাম কত জানিস?চাবুক মেরে তোকে সিধা করে দেব। দৃশ্যটি খুব মনোরম।বড় অফিসারের বাপ, এলাকার বড় জমি মালিক মুনাবড় সিং চন্দেলা গাড়ির জোয়াল মানুষের কাঁধে জুতে গাল পারছে, চাবুক নামাচ্ছে বাতাসে গনোরি গাড়িটি কাঁধের জোরে তুলতে চেষ্টা করে। চেষ্টা করতে গিয়ে মুখ থুবরে পরে যায়। ওর উপর জোয়ালটা চেপেবসে।"[২০]

গনোরিয়া চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যায় আর বাড়িতে দৌলতি ও তার মা অনাহার ক্লিষ্ট জীবন যাপন করতে থাকে। এই অনাহার ক্লিষ্ট নব যৌবনে পদার্পনকারী দৌলতিকে দেখে নিজেকেই সামলাতে পারলেন না ব্রাহ্মন পরমানন্দ। সে দৌলতিকে কাপড় দান করে স্নেহ করে। কারণ এই দৌলতির রূপ চেহারা সদ্য যৌবনা শরীর তার উপার্জনের বড় মাধ্যম ও উপকরণ হবে তাই।প্রথম কয়েকদিন নিজের সাধুত্ব বজায় রাখলেও পরে পশুত্ব বৃত্তিকারী পরমানন্দ দাঁত নখ বের করে আসল চেহারা দেখিয়ে দেয় নিজের। সে দৌলতিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। দৌলতির বাবাকে কামিয়ৌতি থেকে ছুটাবে এই প্রত্যাশাও দেয়। নির্লজ্জের মতো বলতে পারে,

"আমার কামিয়ৌতি খুব অপছন্দ
আমি দয়াবান, পরম দয়াবান
বাপ পিতামহ রেখে গেছে কামিয়া
তাদের দিয়েছি মুক্ত করে ....
কলি যুগে ব্রাহ্মনেই হল অচ্ছুতের মুক্তি দাতা
আমি সেই ব্রাহ্মন, শংকর নারায়ণ আমি।"[২১]

এই নারায়ণের আসল রূপ বেরিয়ে আসে যখন সে বিয়ের প্রস্তাব দেয়,-'নারায়ণ হয়ে কাজে নেমেছি, সঙ্গে লক্ষ্মী চাই। তোর মেয়ে দৌলতিকে আমি বিয়ে করব।'

বলা বাহুল্য, এই বিয়ে মানে শুধুনাম মাত্র বিয়ে, প্রকৃতপক্ষে দৌলতিকে দিয়ে করানো হবে বেশ্যাবৃত্তির কাজ। রেন্ডির কাজ। আর এই বিয়ের প্রলোভন হচ্ছে মলিন্দরের কাজ থেকে পরমানন্দের কাছে কামিয়ৌতির বিক্রয়। কেননা পরমানন্দ তিনশ টাকা মলিন্দরকে দিয়ে গনোরিয়াকে ছাড়ায় কামিয়তি থেকে। মলিন্দর গনোরিকে ছেড়ে দেয় কিন্তু খানিকটা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে,

"এখনো বেকসুর আরো তেরো বছর তোকে খাটাতে পারতাম। কিন্তু তা পারিনা, দয়ার শরীর আমার.....কামিয়ৌতি ধার তো রক্ত বীজের ফৌজ, বেড়ে চলে হাজারে হাজারে। আমি তো তোকে খাটাতে পারি আরও কত কাল যত কাল বাঁচবি, রেখে দিতে পারি কামিয়া করে কামিয়ৌতি ধার শেষ হয় না কখনো।"[২২]

সত্য কথাই বলেছে মলিন্দর সিং। কেননা তারা কামিয়তি ধার কখনই শেষ করে না। যে ধার গ্রহণ করে সে তো কামিয়তি থাকে সারা জীবন ধরে আবার নিজের পরবর্তী প্রজন্মতেও যে সন্তানরা জন্ম গ্রহণ করে তারাও এই কামিয়তিতে প্রবেশ করে। ঋণের

বোঝা মাথায় করে পূর্ব পুরুষের ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করে। এই গল্পেও তাই হয়েছে। গনোরি মুক্তি পায় বটে কিন্তু বিনিময়ে কামিয়তিতে প্রবেশ করে দৌলতি। দৌলতি হয়ে ওঠে পরমানন্দের কামিয়তি। সে পরমা নন্দের কামিয়তিতে রেন্ডি হয়ে যায় আর দিনরাত চলে নির্যাতন। দৌলতি তার নির্যাতিত ও ধর্ষিত হওয়ার প্রথম রাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে,

> "সবাই বেড়িয়ে গেল। লাটিয়া দর্জা বন্ধ করল। তার পর বলল এই ওঠ কাপড় খোল। দৌলতি চেঁচাতে গেল, ভয়ে গলা দিয়ে স্বর সরল না। লোকটা ওকে হিঁচকে টেনে তুললো। তারপর কাপড়টা টেনে খুলল। দৌলতি বাঁধা দিতে গিয়ে বুঝল, ওর শরীর বর্তমানে অত্যন্ত অবশ শরবতে রাম পিয়ারী কিছু দিয়েছিল। .....টেরা নাগেশিয়ার মেয়ে দৌলতি যেন দেখতে থাকলো ময়ূর কণ্ঠি রেশম সূতির সাদিয়ালীর কাপড়ে সুসজ্জিতা আর একটা দৌলতি কেমন আতঙ্কে চেয়ে আছে। কাপড়টা টেনে খুলল লাটিয়া, জামা ছিঁড়ে ফেলেছে। নিজের জামা খুলে ফেলেছে, লোকটাকি উলঙ্গ হচ্ছে নাকি?..... দর্শক দৌলতি আর নির্যাতীতা দৌলতি কি এক হয়ে যাচ্ছে? লাটিয়া এখন কি করছে? একি? দুই দৌলতি এক হয়ে গেল আর ভীষণ যন্ত্রণায় কোকিয়ে উঠল একটা আর্ত মেয়ের গলা।
>
> পুরুষত্ব সতেজ, সক্রিয়, ক্ষমতাশালী ও পাশব রাখার জন্য লাটিয়া হেকিমি ঔষধ খায়, যৌন ক্ষুধা ওর অপরিসীম। সারা রাতে দৌলতি রক্তাক্ত হয় বার বার। শেষে ওর কান্না মিনতি শোনা যায়নি। "[২৩]

এটাই স্বাভাবিক হরিজন সম্প্রদায়ের রমনীর জীবনে। এরা নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোনো কিছুই করতে পারে না। তাইতো এত নির্যাতন সত্ত্বেও নিজে মুখ বুজে সহ্য করে নেয়। কিন্তু লেখক স্বরের শ্লেষোক্তি তীব্র কষাঘাত করে যখন লাটিয়া নিজেকে অনাবৃত করতে উদ্যত হয়। লাটিয়াকে দেখে সকলই অবাক হয়, যারা আনাবরনে সব সময় মগ্ন হয়েই থাকে তাদের কাছে আবরন কি একটা বিলাসিতার বাহুল্য নয়! প্রশ্ন জাগে, নীতিহীন কামনা বাসনায় শৃঙ্খলহীন নির্লজ্জ পাশব সমাজে লাটিয়ার মতো পুরুষের কাপড় খুলে নির্লজ্জতা প্রমানের আদৌ দরকার আছে কী! শুধু দৌলতিই নয়, রামপিয়ারি, সোমনি, ঝালো প্রভৃতি মেয়েরাও একই কমিয়ৌতি প্রথায় রেন্ডি। আর তাইতো পাঠক বর্গের আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে শুধুমাত্র এরাই এই পেশায় আগত নারী নয়। গোটা ভারতবর্ষের অন্ত্যজ শ্রেণির নারী সমাজের চিত্রও একই। দালাল, বদমাস, খোচ্চোর, শয়তানদের দ্বারা প্রতি নিয়তই নারীরা যে এইভাবেই নির্যাতিত হচ্ছে। এই নির্যাতীত চিত্রেরই একটা সংক্ষিপ্ত বাস্তব রূপ মহাশ্বেতা এই গল্পে তুলে ধরেন।

উলঙ্গ বিবস্ত্রা অসহায় ধর্ষিত দৌলতির পরে থাকা দেহের চেয়ে পরমানন্দের কাছে বেশ্যাবৃত্তির উপার্জনের টাকার মূল্য অনেক বেশি। তাইতো সারারাত লাটিয়ার সঙ্গে থাকে দৌলতি, নির্যাতীত ও ধর্ষিত হয়। আর লাটিয়ার কাছ থেকে মুঠো ভরা পয়সা নেয় পরমানন্দজীর মতো দেওতা। দৌলতির সঙ্গে থাকা অন্যান্য মেয়েরাও কেউ ইচ্ছা করে আসে না এই নির্মম ব্যবসায় নিজেকে শেষ করতে। তাদেরকেও দৌলতির মতো করে বাধ্য করা হয় রেন্ডি হয়ে থাকার জন্য আর সে কথাই বলে রেন্ডি দলের সর্দারনি রাম পিয়ারী,

> "এরা সবাই পরমানন্দের কামিয়া দৌলতি আর রেওতী আর সোমনী খেত মজুরি, মাটি কাটাই, কুয়া কাটাই কাজ করেনা, ও করে না, সে করে না–মালিক এদের জমি বানিয়ে নিয়েছে শরীরের জমি চষে চষে ফসল তোলে মালিক ওরা সবাই পরমানন্দের কামিয়া।"[২৪]

এই কামিয়ৌতিতেই কলাবতীর মৃত্যু হয়। এরা মরে গেলে কিছু হয় না। এদের কেউ কাঁদার নেই। এদের কোন শেষ ক্রিয়া হয় না, শ্রাদ্ধ হয় না। সমাজে ওঠার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই করা হয়। কোন বিলাসীতা নেই, সারা জীবনে কেউ কেউ ভাতের স্বাদ পায় না। ঘাট,কচু, মারুয়া খেয়ে জীবন কাটায়। এরাই হয়ে ওঠে কামিয়তি। এই কামিয়ৌতি প্রথা গোটা ভারতবর্ষেই রয়েছে। আলাদা আলাদা নামে, যেমন,

> "অন্ধ্রের মাতাংগী, জাগগালি, মালাজাংগম, মাহার আর অন্যান্য জাতের মানুষ হয় গোঠী। বিহারের চামার, নাগেসিয়া, পারহাইয়া, দুসাদ হয় কামিয়া বা সেওকিয়া। গুজরাটের চালওয়ারী, নালিয়া, ঠোরি ও অন্যরা হয় হালপাত। কর্ণাটকের অন্ত্যজরা জীথো হয়, মধ্য প্রদেশেরহয় হরোয়াহা। উড়িশ্যার গোঠী আর রাজস্থানের সাগরি। তামিল নাড়ুর চেট্টি রায়তরা রাখে ভূমি দাস। উত্তর প্রদেশেরভূমিদাসদের নাম মাত বা খন্ডিত – মুন্ডিত বা সঞ্জায়ত।লাক্ষাদ্বীপের ভূমিদাসরা হল নাদাপু।"[২৫]

এভাবেই গোটা বিশ্বেই চলতে থাকে এই প্রথার নিরিখে নারী শরীরের রমরমা ব্যবসা। আমরা দেখেছি নারীরা একই সঙ্গে দু রকমভাবে শোষিত হয়। প্রথমত নারী হওয়ার জন্য দ্বিতীয়ত গরীব হওয়ার জন্য। তাইতো দৌলতি দারিদ্রসীমার নিম্নে বসবাসকারী পরিবারের সন্তান হওয়ার জন্য হয় কামিয়ৌতি। নারী হওয়ার জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আভিজাত্য শ্রেণির মানুষের ক্ষমতার দ্বারা হয় বার বার ধর্ষিত। এবং অবশেষে পেশাদারি রেন্ডিতে পরিণত হয়। দৌলতির যৌবন, সৌন্দর্য, রূপ লাবণ্য যতদিন বজায় ছিল ততদিন দৌলতি শরীরের বিনিময়ে ছিল লাটিয়ার। যখন রূপে ভাটা পরে তখন লাটিয়ার আর প্রয়োজন নেই দৌলতির শরীরের। তাইতো সে আলাদা আনকুড়া রেন্ডির সন্ধান চায় পরমানন্দের কাছে। কিন্তু দৌলতির শরীরের চাহিদা ফুরায় না। কেননা লাটিয়ার মতো পয়সা ওয়ালার থেকে কম পয়সা ওয়ালার শরীর হয় দৌলতির। দৌলতি পাঞ্জাবী সিং জীর বাঁধা রেন্ডিতে পরিণত হয়। হাজার হাজার টাকা কামায় পরমানন্দ দৌলতিকে দিয়ে

তথাপি তার কামিয়ৌতির টাকা শোধ হয় না। অবশেষে দৌলতির মূল্য হয় জনপ্রতি এক টাকা। দিনে যতজন পুরুষের যৌবিক চাহিদা মেটাবে তত টাকা পাবে পরমানন্দ। অর্থাৎ দৌলতি যত সঙ্গম করবে পরমানন্দ তত পয়সা পাবে। দৌলতি তার নিজের উপার্জনের পয়সার মালিক নয়। তাইতো দৌলতির বহু সঙ্গম জনিত রোগ দেখা দেয় অবশেষে, লাটিয়া ছেড়েদেয় দৌলতিকে,

> "একদিন সকালে উলঙ্গ লাটিয়া চেঁচাতে শুরু করল, রামপিয়ারী! এ রামপিয়ারী! বোলা মিশিরকে! ঔর একনতুন হরিজন মেয়ে দেখতে বল। দৌলতিকে মজা হচ্ছেনা আর। এ মাল ভসকা হয়ে গেছে।"[২৬]

সিং জী দুবছর বাদে অন্যত্র চলে যায়। আর দৌলতিও কোঠায় চলার মতো রেন্ডি নয়। তাইতো এই আপদ বের করে দেওয়াই ভালো। দৌলতি তিনশো টাকার কামিয়ৌতি সে প্রতিবাদ জানায় সাহেবের কাছে নিজের হিসেব দিয়ে। এভাবে,

> "লাটিয়া জী মাসে তিনশো টাকা দিত আর তিন বছর ধরেদিয়েছে,..... সিংজী দিত আড়াইশো টাকা মাসে। সেও তিন বছর। তারপর থেকে ..... তা কোন দিন পাঁচ জন, কোনদিন দশজন, মেলার সময়ে বিশজন গ্রাহক দশ দশ টাকা। দুবছর তো হল। দেখ প্রসাদ, মোহন দেখ হিসেবটা। গড়ে মাসে একশোজন যদি হয় মাসে হাজার টাকা বছরে বার হাজার দুবছরেচব্বিশ হাজার? বেঁচে আছে কি করে? তিনশো টাকা ১৯৬২ সালে লগ্নি করে – ১৯৭০ সালেরমধ্যে ও কতটাকা তুলেছে? চল্লিশ হাজারের উপর?"[২৭]

এভাবেই দৌলতিদের শরীরের রক্ত চুষে চুষে টাকা আদায় করে পরমানন্দের দল। অথচ কামিয়ৌতির ঋণ জীবনে কোন দিন পরিশোধ হয় না। রেওতির ক্ষেত্রেও তাই

হয়েছে। সেও কামিয়ৌতি রেন্ডি। ইচ্ছে করে সে রেন্ডি হতে আসেন নি। কেউ ইচ্ছে করে আসে না। অভাব এবং জমিদার শ্রেণির শাসন এই সম্প্রদায়ের নারীদের রেন্ডি হতে বাধ্য করে। রামপিয়ারী বলে,

> "না এসে উপায়? মরদ তো ওর কাছে দুশো টাকানিয়ে ছিল। জমিজমা নিবে বলে। বাস, এক বছরে হয়ে গেল চার হাজার টাকা তখন দেওতা মরদকে বলল,শোধ তো করতে পারবি না কামিয়া তুই। বউটাকে পাঠিয়েদে। পাঁচ বছরে ধার শোধ হবে, বউ হাতে টাকানিয়ে ঘরে ফিরবে। ছেলেটাকে স্বামীর কাছে রেখে আমি চলে এলাম।"[২৮]

সোমনি গালে হাত দিয়ে দু:খের কথা বলে, ' কি অবাক কাণ্ড মা। ছোটবেলা সাদি হয়েছিল মরদের কাছে এতদিন থাকলাম। মটে একটা ছেলে হল। আর লাটিয়া আমাকে পর পর তিনটে ছেলের মা বানিয়ে দিল?'[২৯] এটাই নিয়ম, যে দিন এখানে কাজ করা মেয়েরা এখান থেকে মুক্তি পায় সেদিন আর কিছু করে খাওয়ার মতো শক্তি শরীরে থাকে না, ভিক্ষা বৃত্তি ছাড়া।

দৌলতির ক্ষেত্রে ভিক্ষা করার মতো শক্তিটুকু পর্যন্ত ছিল না। যখন তার শরীরে খারাপ রোগ ধরা পরে তখন তার ব্যবহারের বস্তু হয় মাটির পাত্র, থাকার জায়গা হয় ঘুটে কয়লা রাখার ঘর। তাইতো দৌলতির ব্যথা থেকে হয় কাশি, আর কাশি থেকে আসে রক্ত। দৌলতি চোখ বুজল। সেই স্বাধীনতা দিবসের দিন। পয়লা ভাদ্র স্বাধীনতা দিবস। তহরির স্কুলের মাঠে ভারত বর্ষের ম্যাপ আর সেই ম্যাপেই দৌলতি চোখ মুজল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক,

> "মোহন শ্রীবাস্তব নেমে এলো ঘর থেকে, তারপরসামনে চেয়ে দেখে ও চোখ বুজল। কেঁপে উঠলবার বার যেন ওর

> হাত পা বেঁধে ওর ওপর মেশিনগান খালি করা হচ্ছে। আসমুদ্র হিমাচল ভারত উপদ্বীপের সবটুকু জুড়ে হাত পা চিতিয়ে পরে আছে বন্ডেড লেবার, কামিয়া রেন্ডি দৌলতি নাগেসিয়ার নির্যাতীত, যৌন ব্যাধি গলিতশব, ঝাঁজরা ফুসফুসের সবটুকু রক্ত বমি করে। আজ পনেরই আগস্ট স্বাধীনতা পতাকা দণ্ড প্রোথিত করার একটু জায়গাও দৌলতি মোহন দের ভারতবর্ষে রাখেনি। মোহন এখন কি করবে? ভারত-জোড়া হয়েদৌলতি।"[৩০]

অনবদ্য বিশ্লেষণ চমৎকার ভাষা ব্যবহার গল্পে বিবৃতি ধর্মীতাকে যেন ছাপিয়ে গেছে। স্বাধীন ভারতের পতাকা জুড়ে পরাধীন নারীর গলিত শব যেন স্বাধীনতার যথার্থকেই কটাক্ষ করছে। স্বাধীনতার ত্রিবর্ণ যেন দৌলতিদের অভিশপ্ত জীবনে বর্ণহীন হয়ে গেছে। যে দেশের আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার স্তরে স্তরে নারী শোষণের অভিশাপ লেগে আছে, সে দেশের স্বাধীনতা মূল্যহীন প্রহসন মাত্র। যে দেশকে কামিয়া, রাখালনি, দেবদাস, রোমথা আজও নিয়ন্ত্রণ করে সে দেশের স্বাধীনতা কাগজে স্বাধীনতা, রক্তমাংসের মানুষের স্বাধীনতা নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাদম্বরী যেমন, 'মরিয়া গিয়া সে প্রমান করে মরে নাই।' আলোচ্য গল্পেও দৌলতিও ঠিক তেমন করে প্রতিবাদ জানায় তার মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। এবং সর্বোপরি লক্ষ করার বিষয় তার মৃত্যুর দিন, তারিখ এবং মৃত্যু বরণ করার স্থান। কেননা লেখিকার এই বর্ণনার মধ্য থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, যে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়, যে জন্য পালন করা হয়, সেই স্বাধীনতা কী আদৌ পেয়েছে ভারতবর্ষ। যদি হয়েও থাকে তবে এ কেমন স্বাধীনতা, যেখানে শুধুমাত্র উচ্চ শ্রেণির মানুষের প্রভুত্ব এবং নিম্ন শ্রেণির মানুষ শোষিত। তাইতো দৌলতির প্রতিবাদ,সে এই পতাকা উড়াতে দিতে রাজী নয়। কেননা এ দেশ এখনও স্বাধীন নয়। এদেশ স্বাধীন হয়নি বরং বলা যায়

ভারতের মালিক বদলেছে। দৌলতি যেন তার মৃত্যুর মধ্যদিয়ে নীরবে নিরালায় নিরিবিলিতে নতুন আর এক স্বাধীনতার সংগ্রামী, প্রতিবাদী ধ্বজা ধারী সৈনিকের মতো বলতে চায়, এই স্বাধীনতা মিথ্যা স্বাধীনতা, এ স্বাধীনতা উচ্চশ্রেণির স্বাধীনতা, সর্বোশ্রেণির নয়। এ প্রতিবাদ আরও প্রখর হয় মহাশ্বেতার নিজস্ব জবানিতে,

> "স্বেচ্ছায় কে হয় দাস? হয় ঋণেরদায়ে। যার জমি নেই, অথচ যে ভূমি জীবি, অথবা যে ছোট চাষি, সে হয় দাস। স্বেচ্ছায় নয় ঋণের দায়ে।
> যে সমাজ ব্যবস্থা টেরা নাগেসিয়াকে কামিয়া বানায়, সে তো পুরুষের তৈরি। তাই দৌলতিকে, সোমনিকে, রেওতিকে পুরুষের মাংসের ক্ষুধা মেটাতে হয়। নইলে পরমানন্দ টাকা পায় না।
> দৌলতি ভয় পাবে কেন? সে বুঝে গেছে, এটাই স্বাভাবিক এখন আর ওর ভয় নেই।
> এ ঔষধ খেয়ে সে মরতে পারতো।"[৩১]

বলার অপেক্ষা রাখেনা মহাশ্বেতা পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকেও কুঠারাঘাত করতে ছাড়েন নি। চির কালই ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় নানা প্রথার সৃষ্টি করে এসেছে পিতৃ তন্ত্র তার নিজের স্বার্থকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার জন্য। এবং প্রতিটি প্রথার পিছনে লুকিয়ে ছিল নারী শরীর ভোগের উদগ্র কামনা। এই কামনার আগুনেই ঝলসে গেছে ব্রাত্য অসহায় নারীর শরীর। ছলা – কলায় কতভাবে নারী দেহের দাবীদার হয়ে ওঠা এবং প্রয়োজন ফুরালে তৈজস পত্রের মতো ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায় সেই আয়োজনেই বসে থাকে পিতৃতন্ত্র চিরকাল। আর দৌলতির মতো অভাগীরা তার ক্ষতিপূরণ দিয়েই চলে আজীবন ভর।

‘গোহুমনি’

প্রথম প্রকাশ অজ্ঞাত, পুনর্মুদ্রণ – রুদালী, দে’জ পাবলিশিং ১৯৯৩ খ্রি:

মহাশ্বেতা দেবী দৌলতির প্রতি হওয়া নির্যাতনের প্রতিবাদ নিজেই করেছেন কিন্তু গোহুমনির ক্ষেত্রে তা করতে হয় নি। এই গল্পে গোহুমনি নিজেই একজন প্রতিবাদী নারী চরিত্র যার ফল স্বরূপ গোহুমনিকে উচ্চ শ্রেণির জোতদার, ঠিকাদার, মালিক, মহাজনের কাছে শোষিত হতে হয় ঠিকই কিন্তু ধর্ষিত হতে হয় না দৌলতির মতো। ‘দৌলতি’, ‘পালমৌ’, ‘গোহুমনি’ প্রভৃতি গল্পে মহাশ্বেতা শুধু নারীর জীবন যাপনে কঠরতা শোষন নির্যাতনকে তুলে ধরতে গল্পের রচনা করেননি। বরং বলা যায় নিম্ন-অন্ত্যজ শ্রেণির হয়েও কেউ দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে কীভাবে ঠেঁকে বসে তাও দেখিয়েছেন। জীবনের অভিজ্ঞতাই তাদের শিক্ষাদেয়। লেখিকা নিজেও তার রচনা সমগ্রের ১৩তম খণ্ডের ভূমিকায় ‘গোহুমনি’ গল্প প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন,

> “.... ‘দৌলতি’ দাস মজুর জীবনের নির্মম শোষণ নিয়ে লেখা, ‘পালামৌ’ দাস মজুর জীবনের জাগৃতি আসার, ওরা

> সংগঠিত হবার সত্য কাহিনি, যদিও বাস্তবে পালামৌয়ের দাস মজুর পুরুষ রমণী, বালক বালিকা প্রথম ঢুকেছিল ০১/০৫/১৯৮১, ডালটন গঞ্জ, জেলা প্রশাসন ও নগর বাসী সবাই চমকে উঠেছিল, বোবা বিস্ময়ে ও আতঙ্কে দেখেছিল ওদের। আর 'গোহুমনি' গল্পে পৌঁছে ওরা নির্ভীক হতে শিখে গেছে। 'গোহুমনি' গল্পে দেখছি দাসত্ব বন্ধন কাটাবার জন্য ঠিকাদারের লেবার হিসেবে ওরা চলে যাচ্ছে। আবার ঠিকাদার আনিত লেবার রাও যে চুক্তিবদ্ধ দাস মজুর, সে সত্য প্রকাশ পেয়েছে।.....
>
> 'দৌলতি' ও 'পালামৌ' এর মতো 'গোহুমনি'র ক্ষেত্রেও দেশ, গ্রাম, পথঘাট, বর্ণিত মানুষ জন, ওদের জীবনের ঘটনা এত আমি ১৯৬৩ – ১৯৮১ ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি।"[৩২]

বাস্তব সমাজের রূপকার মহাশ্বেতা সমাজে প্রচলিত বিধিবিধানকে অবিকলভাবে প্রকাশ করেন তার সাহিত্যে। 'গোহুমনি'তেও সমাজের একেবারে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতি নির্যাতন ও শোষণের কথা উল্লেখ করেছেন। এই শোষণ, শাসন, নির্যাতন মানুষকে দাসত্বে পরিণত করার প্রক্রিয়া এবং মানুষ মারার রাজনৈতিক খেলায় স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে গোহুমনি নামক চরিত্রটি। গোহুমনি এই গল্পের প্রধান নায়িকা। গল্পের শুরুতেই মহাশ্বেতা গোহুমনির পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন,

> "গোহুমন হল গোখড়ো সাপ। তা বিশাল ভুঁইয়ার বিধবাকেসবাই গোহুমনি বলে। নাম একটা ওর ছিল, ঝালো। তা কতকাল ধরেই তো ওর নাম ছিল সোনা দানির মা। ছেলে আর মেয়ে হলে কে আর কাকে 'ঝালো' বলবে তাইবলো? বলাটা ঠিকও নয়।"[৩৩]

লেখিকা এখানে গোহুমনের পরিচয়ের পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে নারীর প্রথাগত পরিচয় যে তার সম্পর্কের বিন্যাসে ঢুকে যায় তাই বলেছেন। কিন্তু একটু গভীর ভাবে ভাবলে আমাদের সামনে উঠে আসে নারীর পরিচয় পত্রের পরিবর্তনের দিক গুলি। অর্থাৎ নারী মেয়ে, স্ত্রী, মা, নয় বিধবা এই কয়েকটি পরিচয়ে পরিচিত হবে নারী এটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ নারীর পরিচয় লুকিয়ে থাকে পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা এবং না থাকার উপর ভিত্তি করে। যাই হোক মহাশ্বেতার উদ্দেশ্য এটা ছিল না। তার উদ্দেশ্য ছিল গোহুমনির জীবন যাপন প্রনালী, সমাজের শকুনদের ছোঁ মারার প্রথাগত অভ্যাসের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর এবং জমিদার – জোতদার, মালিক, মহাজন, ঠিকাদারদের মিথ্যে প্রলোভন, নির্যাতন ও ধর্ষনের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের জীবন, শরীর, দেহ মনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রান লড়াইকে জাগিয়ে রাখা।

গোহুমনের স্বামী বিশাল আদিবাসী অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ। এই শ্রেণির মানুষের অন্তর্ভুক্ত ভুঁইয়া, চেরো, খাড়োয়ার, কোল জাতি, দুসাদ, গঞ্জু, ঘাসি, নাগেসিয়া, পারহাইয়া, এমন অনেক নিম্ন শ্রেণির মানুষ মালিকের কেনা গোলাম, কামিয়ৌতি, দাস নাম মাত্র মজুরিতে কৃষক শ্রমিক থেকে গেছে আজীবন কাল। একবার যদি কোন নিম্ন শ্রেণির মানুষের নাম মালিক মহাজনের খাতায় ওঠে তাহলে বংশ পরম্পরা অনুযায়ী কেউ বেরিয়ে আসতে পারে না। বিশালও ঐ একই পরিস্থিতির শিকার। শুধু বিশাল নয়, বিশালের স্ত্রী গোহুমনি বা ঝালো, বিশালের দাদা সাতবান এরা সকলই সমুন্দরের কামিয়া। কেননা এদের ঠাকুরদা একষট্টি টাকা সমুনন্দরের বাবার কাছ থেকে ধার নিয়েছিল। এখন সেই টাকার পরিমান চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বেড়ে বেড়ে তিন হাজার টাকায় পৌঁছেছে। খুব বদ মেজাজী বিশাল সে রেগেগেলে বৌকে পেটাত। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, নিম্ন শ্রেণির মানুষেরা স্ত্রীকে মার ধর করে কিন্তু মজার বিষয় সমুন্দর বিশালকে বুঝাত,- 'রাবণ রাজা মন্দোদরীকে পিটাতেন। তাতেই তার পতন হয়েছিল।' অথচ নিজে তার বৌকে পিটাতে গিয়ে পা পিছলে পরে প্রান হারিয়েছে। উচ্চ–মধ্য–নিম্ন সব শ্রেণির পুরুষই নারীকে ব্যক্তি মর্যাদার দিক থেকে, স্বাধীনতার দিক থেকে এবং অধিকারের দিক থেকে শাসন ও শোষন করেই আনন্দ পায়।

বিশাল প্রতিবাদ করে কামিয়ৌতি, কামিয়া, দাসত্বের বিরুদ্ধে। কিন্তু ব্যর্থ হয় এবং এক সময় এলাকা ছেঁড়ে পালিয়ে যায়। বাইরে কাজ করে অনেক বেশি টাকা উপার্জনের জন্য। মালিকের নিয়ম অনুযায়ী গোহুমনি হবে এবার সমুন্দরের কামিয়ৌতি। কিন্তু ধারাবাহিক প্রথাকে গোহুমনি অমান্য করে এবং স্পষ্ট বলেদেয়,-

> "যে টিপসহি দিয়ে টাকা নিল তার খাটার কথা। আমি টিপসহি দিলাম না, টাকা নিলাম না, আমি খাটব কেন?"[৩৪]

যে জমিদার, মহাজনের বিরুদ্ধে মানুষ মুখোমুখি কথা বলতে ভয় পায় সেখানে গোহুমনি মুখের উপর না করে দেয়, মালিকের বিরুদ্ধে কথা বলে। এই প্রতিবাদ আরও বেশি প্রখর হয় যখন তসিলদার গোহুমনের শরীর জড়িয়ে ধরেছিল। যুগ যুগ ধরে চলে আসছে আদিবাসী অন্তেবাসী সকল শ্রেণির নিম্নজাতের নারীরা সরকারী কর্মচারী-জমিদার-জোতদার–মহাজন, জমিদারের ছেলে, ঠিকাদার প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ধর্ষিত ও নির্যাতিত হবে কিন্তু তার কোন বিচার হয় না। অকপটে এরা অন্যায় করে চলে অন্ত্যজ শ্রেণির নারীর উপর। কোন প্রতিবাদ হয় না। যদি কোন আদিবাসী বা যে কোন অন্ত্যজ শ্রেণির মেয়েকে মহাজন বা জোতদার, মালিক, সরকারী ক্ষমতাবান কর্মচারী কোন নারীকে জড়িয়ে ধরে বা নির্যাতিত ও ধর্ষিত করে তাদের শুধুমাত্র সহ্য করা ছাড়া আর কিছু করার উপায় থাকে না। কিন্তু আলোচ্য গল্পে গোহুমনিকে জড়িয়ে ধরায়,

> "ঝালো চেঁচিয়ে উঠল, আর খুবই ঝটাপুটি হল। শেষে ঝালো ওর হাতে দাঁত বসিয়ে দেয় বাঘের মতো। তখনতো বহুত গোলমাল বেঁধে গেল। ঝালো কে শিক্ষা দেবার জন্যে...। ওদের জাতে মেয়েদের তো এত ইজ্জত থাকে না।"[৩৫]

ধারাবাহিক ভাবে চলে আসা নারীর প্রতি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে গোহুমনি শুধু প্রতিবাদই করে না, সঙ্গে সঙ্গে সংঘাতও তৈরী হয়ে যায় সরকারী তসিলদারের হাতে

দাঁত বসিয়ে দেওয়ার মধ্যদিয়ে। ঝালো লড়াই করে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়েই থেমে থাকে না। সে তারপ্রতি হওয়া নির্যাতনের বিচারও চায় আমিন বাবুর কাছে।

> "ঝালো কাঁদতে কাঁদতে এল আর বলল, পথের কুত্তিরও যদি কখনো ছুটি মিলে তবু আমাদের মিলে না। মালিকরা তো আমাদের বিনি পয়সায় রেন্ডি করেই রেখেছে। ঔর তোমার সরকারী তসিলদার, একে কোন শাস্তি দেবে?..... আমিন বাবু ওকে মা! বোন! বেটি! বলে যতই মানায় ও ততই বলে, মা – বোন – বেটি! তোমার মা বোন বেটিকে এমন বেইজ্জত করলে যেমন শাস্তি দিতে, তেমন দিতে পারবে? অপরাধি তো একদম চুপ, গুংগা যেন। চুপটি করে বসে থাকল। বেশ একটা গোল পেকেছে দেখে কামিয়া লোকও জুটে গেল। বহুত তামাসা লেগে গেল।"[৩৬]

এই মালিকেরা, বাবুরা, পুলিশ, প্রশাসন, সরকারী কর্মচারী, পিয়ন, ঠিকাদার, মস্তান, ট্রাকচালক, জঙ্গল রক্ষী সকলই কামিয়া ও অন্যান্য মেয়েদের ভোগ করে এসেছে আজীবন কাল, বেঁচে দিয়েছে, রেন্ডি করেছে কিন্তু এই গোহুমনি বা ঝালো ধারাবাহিক ভাবে চলে আসা হাওয়াকে বিপরীত দিকে ঠেলে দিয়েছে। সে তসিল দারের কাছ থেকে তাকে নির্যাতনের অপরাধ স্বরূপ পঁচিশ টাকা জড়িমানা করেছে। সমাজকে সচেতন করার জন্য টাকার পরিমান বা অপরাধের শাস্তির পরিমান নিতান্তই কম হলেও লোক মুখে প্রচলিত হতে হতে প্রতিবাদের কথা ছড়িয়ে পরবে। এবং এই প্রতিবাদ শুধু গোহুমনির একার প্রতিবাদ হয়েই থেমে থাকবে না। গোটা সমাজের সমস্ত গোহুমনির প্রতিবাদ হয়ে দেখা দিবে। সচেতন হবে গোটা সমাজের মানুষ। সমস্ত অন্ত্যজ শ্রেণির নারীদেরও ব্যাক্তি মর্যাদা আছে সমাজে তারাও প্রতিবাদ করতে পারবে অন্যায়ের, অত্যাচারের, নির্যাতনের ও নিপিড়নের বিরুদ্ধে। এই সমাজে বসবাসকারী কামিয়া নারীরা যে সচেতন হয়েছে সে কথাও স্পষ্টভাবে বোঝা যায় বাসনীর মধ্যদিয়ে,

> "বাসনী ঝর ঝর করে কাঁদে ঘরে এসে। মা-র কাছেবসে কাঁদে। হায় মা! হায় মা! একবার ধরম নিলে পঁচিশ টাকা যদি হয় তাহলে সরপঞ্চের কাছে আমার একমাসে দশ পনের বার পঁচিশ টাকা পাওনাহয়। আর নওনে হালের ঠাকুরদার কাছে তোর পাওনা হয় ....."[৩৭]

এই আদিবাসী সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির নারীরা এখন আর পিছিয়ে থাকবে না। কর্মময়তার দিক থেকে সর্বোপ্রকার মানুষের মধ্যে এরাই সর্বাধিক স্বাধীন। কেননা এরা কোন পুরুষের সহযোগিতা সহানুভুতির এবং অর্থ ও খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল নয়। এরা যথেষ্ট পরিশ্রমী হয়। নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজেরাই সংগ্রহ করতে পারে নিজস্ব পরিশ্রমের অর্থের বিনিময়ে। এবারে তারা স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকারও মূল মন্ত্র পেয়ে গেছে। কেননা এখন আর জমিদার-জোতদার বা মহাজনের হাতের পুতুলের মতো নড়বে না। তাদের দ্বাড়া ধর্ষিত হবে না। কারণ এখন তার জন্য বিচার ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং তারা সচেতন, এবং সমাজে তাদের একটা ইজ্জত রয়েছে। সেকারনে বাসনী গর্বের সঙ্গে বলে,

> "সাহস করে ঝালো রুখে দাড়াল তো বড় কাজকরেছে। আমাদের ইজ্জতও বেড়ে গেল। মালিকরা তো এও মানেনা যে ঘরে আমাদের ছেলে মেয়ে আছে কি না। রেন্ডি কাজে পয়সা মিলে এ তো তেমন হল না।এ তো জরিমানা আদায় করল ঝালো! এটাকায় ইমান আছে, না কি বল? "[৩৮]

এ হল গোহুমনির অধিকারের টাকা। এখানে সংবিধান আর উচ্চ শ্রেণির মহাজন ও জোতদারের নয়। এখন এই সমাজের নারীরা নিজেরাই সংবিধানে উল্লিখিত অধিকার আদায় করতে শিখেছে। তাইতো গল্পের অন্তিমে সকল নারীকেই গোহুমনি মনে হয়

লক্ষ্মনের। কেননা অন্যায় করলে যে কোনো মেয়ে যে কোন মুহুর্তেই গোহুমনির রূপ ধারণ করতে পারে, যার নিশ্বাসে মৃত্যু।

সর্বোপরি বলতেই হয় মহাশ্বেতা এই গল্পে আদিবাসী অন্ত্যজ শ্রেণির জীবন গাথা যতখানি বর্ণনা করেছেন ঠিক ততখানি বর্ণনা করেছেন গোহুমন বিবির জীবন বৃত্তান্ত। আর এই জীবন বৃত্তান্তে প্রবল প্রতিবাদী সংঘাত সৃষ্টিকারী আদিবাসী নারীদের জীবনের জয়গান গেয়েছেন। পাশাপাশি সমস্ত অনগ্রসর নিম্নশ্রেণির নারীদেরকে সর্বোপ্রকার শোষণ, শাষন ও নির্যাতন থেকে মুক্ত হওয়ার কামনাই প্রকাশ করেছেন।

‘শিকার’

প্রথম প্রকাশ অজ্ঞাত, পুনর্মুদ্রন – মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন/ ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ১৯৯৩-১৯৯৯

গোমো, ডালটনগঞ্জ, টাহার, রাঁতা অঞ্চলের আদিবাসী সমাজের সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ‘শিকার পর্ব’ নিয়ে রচিত ‘শিকার’ গল্পটি। গল্পে সাংস্কৃতিক বিধিকে অতিক্রম করে মেরি নামক একটি আদিবাসী মেয়ের ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, লড়াই এবং সংঘাতের মধ্যে। মহাশ্বেতা এই কাহিনিকে কল্পনার অনুসরণে রচনা করেননি। বাস্তবে ঘটে যাওয়া কাহিনিকে অনুসরণ করেই ‘শিকার’ গল্পটি রচনা করেছেন। লেখিকা নিজেও গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভককে এই গল্পের বিষয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন,

> “ধরাযাক ‘শিকার’। এলাকাটা আমি যেন দেখতে পাই, এতই চিনি। গল্পে যাকে মেরি ওঁরাও বলেছি তাকে দেখেছি, বিহারেও আছে বাৎসরিক শিকার পরবে। এছিল ন্যায় বিচার উৎসব। শিকারের পর সমাজ পতিরা অপরাধীর বিচার

করতেন, ওরা পুলিশের কাছে যেত না। সাঁওতালী ভাষায় এটা ল-রিব্। 'ল' মানে আইন 'রিব' মানে জঙ্গল। আর বিহারে ' প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এটা 'জানী' পরব। মেয়েদের শিকার উৎসব। ওই গল্পে বর্ণিত সকল ঘটনাই সত্য। সেদিন মেরি যা করে, ওখানে তা বারবার ঘটেছে। আদিবাসী সমাজে নারী ধর্ষণ, স্ত্রীলোককে অমর্যাদা, অবমাননা করা বৃহত্তর অপরাধ। ধর্ষণ ওরা জানে না। আদিবাসী সমাজে মেয়েদের সন্মান আছে। যখন লাপরা যেতাম, দেখতাম ফর্সা মেয়েটি দেহাতি ঢঙে (সামনে আঁচল দিয়ে) হলদে শাড়ি পড়ে এক বিশাল মোষের পিঠে দিব্যি আরামে বসে আছে, আখ চিবচ্ছে, কিংবা ভুট্টার খই। তহরি বাজারে বাজারে দেখেছি পান চিবতে চিবতে ফল ও শাক সব্জির দরাদরি করছে বিড়িও খাচ্ছে, প্রচুর তর্ক করছে এবং জিতে যাচ্ছে কি ব্যক্তিত্ব ! পরে জানলাম পছন্দের মুসলিম ছেলেটিকে বিয়ে করার জন্য পরবের দিন ও কি করেছিল। গান শুনে শুনে জানলাম। আদিবাসীরা তো লেখে না, যখন যা ঘটে তাই দিয়ে গান বাঁধে। যুদ্ধ, লড়াই, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ওরা গানে গানেই ধরে রাখে সকল স্মৃতি। এসব সংগ্রহের কাজ কিছু চলছে। শীতের রাতে খোলা আকাশের নিচে আগুন পোহাতে পোহাতে ওর কাহিনি জানি। যে লোকটাকে মারে, একটা নেকড়েই বটে। আসল কথা গায়ত্রী, সেদিন ছিল জানী পরব। মেয়েদের শিকার উৎসব। সমগ্র আদিবাসী সমাজের চোখে যা পাপ, তার বিচার করে বাৎসরিক শিকার উৎসবের সত্য অর্থকে ও পুর্নজীবিত করেছিল।"[৩৯]

মহাশ্বেতার নিজের মুখে বলা কথার সঙ্গে গল্পের কাহিনির বেশ একটা সামঞ্জস্য রয়েছে। কেননা গল্পেও আমরা মেরীকে দেখি একটি প্রতিবাদী নারী চরিত্র হিসেবে। সে মোষের পিঠে উঠে, গরু, ছাগল, মোষ চড়ায় বনে জঙ্গলে। চঞ্চল, অস্থির, ফর্সা উচ্চ একটি সুন্দরী মেয়ে। আদিবাসী সমাজের মানুষেরা সকলই হয় কালো। কিন্তু মেরী ফর্সা। মেরীর শরীর ফর্সা হওয়ার কারণ মহাশ্বেতা সুকৌশলে গল্পে উল্লেখ করেছেন,

> "স্বাধীনতার পর ক্রমে ক্রমে সাহেবরা চলে যায়, ডিক্সনদের বাড়ি ও বাঙলো দেখা শোনা করত মেরীর মা। ডিক্সনেরছেলে ১৯৫৯এ এসে বাড়ি জঙ্গল সব বেঁচে দিয়ে চলে যায়। যাবার আগে ভিকনির গর্ভে মেরীকে দিয়ে যায়। সে যায়অস্ট্রেলিয়া।"[৪০]

গল্পে উল্লিখিত মেরীর জন্ম রহস্যেও নারীর প্রতি অবমাননার এবং বঞ্চনার দিকই নির্দেশিত হয়েছে। এবং বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বিদেশি সাহেবেরাও নিজেদের ক্ষমতাকে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পিছুপা ছিলেন না। যার ফল স্বরূপই ভিকনির গর্ভে মেরীর আবির্ভাব।

মেরী ভালোবাসে বাজারের নেতা, মস্তান জালিমকে। তাই সে অন্য কাউকে বিয়ে করতে রাজী নয়। এমন কি আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলেদেরকেও বিয়ে করতে অরাজি মেরী। কেননা তাদের সম্প্রদায়ের ছেলেকে বিয়ে করলে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যাগুলো মেরীর জীবনেও দেখা দিবে। তাই তো তার মা তাকে আদিবাসী ছেলেকে বিয়ে করতে বললে পরে মেরী স্পষ্টভাবে নির্দিধায় জানিয়ে দেয়,-

> "ঝোপড়িতে থাকব, ঘাটো খাব, মরদ, মদ খাবে, তেলসাবান পাব না, ফরসা কাপড় পরব না, অমন জীবনআমি চাই

না।..... প্রনয়ি হতে চেয়েছে বহুবার বহুজন। মেরী দা তুলে
দেখিয়েছে। তারা বাইরের মানুষ। ভিকনির মতো তাকেও
পেটে বাচ্চা দিয়ে ওরা পালাবে না, কে কথা দিতে পারে?”[৪১]

মেরী তার নিজস্ব অধিকার অন্যকারো হাতে তুলে দিতে রাজী নয়। তাইতো সমাজের বিধিকে ভঙ্গ করতে চায়। আদিবাসীর ঘরে জন্ম গ্রহন করলে যে আদিবাসী সমাজের মানুষকেই বিয়ে করতে হবে এই চির প্রথাকে মেরী অমান্য করে। মেরী যেন জন্মগত ভাবেই প্রতিবাদী। তাইতো প্রসাদজীর কথাতেও মেরী প্রতিবাদ জানাতে ভয় পায় না। প্রসাদজী একবার অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বলে মেরী কে,

“কি রে মেরী মৌয়া বেঁচে কত টাকা হল?
আপনার দরকার?
মহাজনি কারবার খুলে দে।
হ্যাঁ তাই খুলবো।
দেখ আমি বলেই তোকে মৌয়া তুলতে দিই। নইলে
সরকারী হক্। নোকর লাগিয়ে তুলে নিতে তো পারতাম?
নেই না তো?
নোকররা এসেই দেখুক। দা আছে না। খুব রুক্ষ ও
গম্ভীর গলা মেরীর।”[৪২]

মেরী শুধু প্রসাদজীকেই নয় তার গিন্নিকেও জব্দ করেন ঋজু ওজস্বী কণ্ঠে। প্রসাদ গিন্নি যখন মেরীর প্রনয়ি জালিমকে নিয়ে মুসলমান বলে ব্যঙ্গ করেন সে সময় মেরী গিন্নিকে বলেন,

“গরীব মানুষের কথা শুনে আপনি কি করবেন? আপনি সাদি
দিয়ে দিবেন? .....কেন? মুসলমানতো সাদি করবে বলছে।

আপনার ভাইতো রাখতেচেয়েছে। মুর্খের মতন জুতোটি খেয়ে গিন্নি চুপ করেন।”[৪৩]

মেরীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেয় না প্রসাদজীর পরিবার। কেননা মেরী ওদের বাড়ির মূল কাজ গুলো নিজে দায়িত্ব সহকারে করে। নিজের স্বার্থের কথা ভেবে মেরীর কটু কথাকে প্রসাদজী এবং তার গিন্নি সহ্য করে নেয়। কেননা মেরীর থাকা না থাকার উপর প্রসাদজীর পরিবারের স্বার্থও নির্ভর করে। তাই তো মেরী ঘরে এবং বাইরে একই রকম প্রতিবাদ দেখায়। চেনা অচেনা, পুরুষ মহিলা, হাটে বাজারে, কোথাও কোনো সমঝোতা করেনা মেরী। তাই তো সর্বদাই মেরী দা রাখে নিজের কাছে নিজেকে শোষণ ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে। মেরী স্ব-সমাজের ছেলে দেরকেও কোন পাত্তা দেয় না। মেরীর প্রতিবাদী রূপের প্রখরতা দেখা যায় ঠিকাদার তসিলদারের আবেদনের বিরুদ্ধে।

মেরী দেহাতি সুন্দর, সুশ্রী, কোমল নয়না, অপরূপ, কোমল শরীর দেখে তসিলদার সিং নিজেকে সংযত রাখতে পারেনা। তাইতো মেরী যখন জঙ্গলে গরু মোষ তাড়িয়ে দিয়ে মোষের পিঠে বসে একলা ফিরছিল তখন সুযোগ বুঝে তসিলদার সিং মেরীকে পাবার জন্য তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং খলনায়কের মতো ভঙ্গিতে বলেছে,

“কি খুব সুরৎ রে ! তোকে হেমা মালিনীর মতো দেখাচ্ছে,
মেরী-কা বোলা।
তসিলদার– হেমা মালিনীর মতো দেখাচ্ছে।
মেরী– তোমাকে উল্লুর মতো দেখাচ্ছে।
তসিলদার সিং এহেন মন্তব্যে খুবই প্রশ্রয় পেল এবং কাছে এল। মেরী মোষটা থামাল না। চলতে চলতে একটি ধারাল দা ও ফস করে বের করল ও অলস কণ্ঠে বলল, তোমার মতো সরুপেন্ট, কালো চসমা পরা ঠিকাদার তহরির রাস্তায় টাকায় দশটা মেলে তাদের আমি এই দা দেখাই। বিশ্বাস না করো গিয়ে জেনে এসো।”[৪৪]

মেরীর প্রতিবাদ ক্রমশ তীব্র হতে থাকে। তসিল দারের আবেগ যত বাড়তে থাকে মেরী যেন ততই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে তরতাজা আগুনের মতো। তসিলদার মেরীকে ভুলতে পারে না। ভুলতে পারেনা মেরীর শরীরকে, রং কে, তাকে নির্যাতন করার বাসনাকে। তাইতো সোজা পথে সহজ ভাবে যখন আসছে না মেরী তখন তসিলদার বুদ্ধি পাকিয়ে তাকে হাতিয়ে নিয়ে আসার বুদ্ধির প্রক্রিয়া চালায়। তসিলদার মেরীকে পরার জন্য একটা দামি শাড়ি দেয় কিন্তু সর্বোসম্মুখে তসিল দারের দেওয়া শাড়ি ফিরিয়ে দেয়, জঘন্য ভাষায় গালি গালাজ করে। এবং বলে,

> "শহরের রেন্ডি পেয়েছিস তুই আমাকে। কাপড় দিয়েভোলাতে এসেছিস? ফের বদমাসি করবি তো নাক কেটে নেব। হাত দুলিয়ে বেড়িয়ে যায় ও সগর্বে।"[৪৫]

কিন্তু তসিলদার থেমে থাকে না। তার পশুত্ব আরও অনেক বেশি বেরে যায়।মেরীকে ভোগ করার কামনা তাকে পাগল করে। তাই তো পরিকল্পিত ভাবে তসিলদার সিং মেরীকে বাজার থেকে ফিরে আসার পথে সন্ধ্যে নাগাদ আলো অন্ধকারে বল প্রয়োগ করে মেরীকে ভোগ করতে। সুযোগ বুঝে তসিলদার মেরীর হাত চেপে ধরে। এবং বলে 'আজ ছাড়ব না'।

> "মেরী প্রথমে ঘাবড়ে যায় ধস্তা ধস্তিতে দা টা ছিটকেপরে। অনেক চেষ্টায় অনেকক্ষণ নিরব ধস্তাধস্তিরপর মেরী ছিটকে সড়ে আসতে পারল। দুজনেই উঠেদাড়াল। তসিল দারের চোখে এখন কালো চসমা নেই।বড় জুলপি, লম্বাচুল, টেরিক্লোথের প্যান্ট, সূচালো জুতো,গায়ে ঘন লাল জামা। হোলির গানের পটভূমিতে ওকে একটা জানোয়ার মনে হল মেরির। জা-নো-য়া-র ! শব্দ গুলো মনে ধাক্কা মারল। হঠাৎ মেরী হাসল।"[৪৬]

প্রতিবাদের চরম সীমাকে অতিক্রম করে মেরী সংঘাতের মধ্যদিয়ে। মেরী বুঝতে পারে গায়ের শক্তি দিয়ে এই জানোয়ারকে বধ করা যাবে না। তাইতো মেরী বুদ্ধির টোপ ফেলায় প্রতিশ্রুতির মধ্যদিয়ে। যার ফল স্বরূপ মেরী নিজেকেও বাঁচিয়ে নেয় আবার হোলির দিনের শিকার পরবের মূল পশুকেও মেরী এই তসিলদারের মধ্যেই খুঁজে পায়। তাই মেরী যুগ যুগ ধরে চলে আসা রেওয়াজ পশু শিকারের দিনই ধার্য করে এই পশুকে শিকার করার জন্য। এই পশুকে যথা সময়ে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য টোপও ফেলে রাখে পুরোপুরি দক্ষ শিকারির মতো অত্যন্ত সুকৌশলে বুদ্ধিদীপ্ততার মধ্যদিয়ে। মেরী বলে তসিলদারকে,

> " আমাকে খুব চাও তুমি তাই না?
>
> খুব।
>
> ভালো।
>
> কী ভালো?
>
> বুঝলাম সত্যিই চাও।
>
> সত্যিই চাই। তোর মতো মেয়ে মানুষ আমি দেখিনি। লাখ টাকার মাল তুই। তোর কদর করবে ও বাজারিয়া ? ও মুসলমান ?
>
> তুমি করবে তো?
>
> নিশ্চয়ই। কাপড় দেব, গহনা দেব-
>
> আচ্ছা?
>
> সব দেব।
>
> মেরী খুব জোরে জোরে নিশ্বাস টানল। তারপর বলল আজ নয়। আজ আমি অশুচ আছি।
>
> কবে, মেরী কবে?
>
> মেরীর চোখ ও মুখ কমল হল। বলল, হোলির দিনে, তুমি থাকবে ঐ বুরুর কাছে। সব মেয়েরা শিকার খেলতে দূরে দূরে যাবে। আমি তোমার কাছে আসব।"[৪৭]

কামনা বাসনায় পরিপূর্ণ তসিলদারের মন মেরীর কথাকে বিশ্বাস করে নিয়েছে এবং যথাস্থানে যথা সময়ে তসিলদার উপস্থিত হয়েছে। সেদিন শিকারের দিন মেরী শজারু, খড়গোস, পাখি, শিকার করবে না। কারণ সে আজ বড় মাপের হিংস্র পশু শিকার করবে। তাইতো চলার পথের সমস্ত অসহায় পশু পাখিকে মেরী শিকার করে না। এবং বুদ্ধিদীপ্তভাবে মেরী সেই নীরব নির্জন, নিরাপদ জায়গা তসিল দারের কাছেই যায়। এবং সুকৌশলে তসিলদারের শক্তিকে মদ খাইয়ে বেহুশ করে। যখন তসিলদার অবশ, চলার মতো এবং কিছু করার মতো ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন মেরী,

> "সাদরে তসিলদারের মুখে হাত বোলায়, ঠোটে চুমকুরি খেল। তসিল দারের চোখে আগুন, মুখ হাঁ, ঠোট লাল মাখা, দাঁতে ঝিলিক, মেরী দেখছে, মুখটা বদলাতে বদলাতে এবার? এবার? হাঁ, জানোয়ার হয়ে গেল।
>
> অব লে মুজকো?
>
> মেরী হেঁসে ওকে জোড়াল, মাটিতে সোয়াল, তসিলদার হাসছে, মেরী দা টা ওঠাল, নামাল, ওঠাল নামাল।
>
> কয়েক লক্ষ চাঁদ কাটল। মেরী উঠে দাঁড়াল। রক্ত? জামায়? কাপড়ে? নালায় ধুয়ে নেব। ক্ষিপ্র নৈপুন্যে ও তসিল দারের পকেট থেকে পার্স নিল। অনেক টাকা। অনে-ক টাকা। কোমরের গেজে খুলে নিজের সঞ্চয়ের টাকার সঙ্গে টাকা গুলো রাখল।
>
> তারপর তসিলদারকে খাদে ফেলল।"[৪৮]

মেরী এখানে শুধুমাত্র নিজের প্রতি হওয়া নির্যাতনের প্রতিবাদ জানাতেই খুন করে না তসিলদারকে, পাশাপাশি গোটা আদিবাসী অন্ত্যজ শ্রেণির সমস্ত নারীর প্রতি হওয়া

নির্যাতনের প্রতিবাদ করে প্রতি শোধ ও নেয়। মেরী শুধুমাত্র আইনকেই হাতে তুলে নেয় না। পাশাপাশি গোটা নারী সমাজের প্রতি হওয়া নির্যাতনকেও শাস্তি দেয়। যে শাস্তি সমাজ দিতে পারে না, সরকার দিতে পারে না, সরকারী আইন দিতে পারে না, প্রশাসন দিতে পারে না, সে শাস্তি দিয়েছে মেরী নিজে। সমাজ সচেতন পাঠক মাত্রই এই শাস্তিকে সমর্থন করবে সন্দেহ নেই। মহাশ্বেতা নিজেও একই অভিমত প্রকাশ করেছেন 'শিকার' গল্প প্রসঙ্গে,

> "১৯৫৫-১৯৫৬ সালের সাওতাল গন বিদ্রোহের কারণ গুলিরমধ্যে অন্যতম ছিল আদিবাসী মেয়েদের ধর্ষন করা। আমি মনে করি, যখন আদিবাসী বা অত্যাচারিত মানুষদের কথাবলছি, এই হিংসা সমর্থন যোগ্য। রাষ্ট্র ব্যাবস্থা যখনন্যায় প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ, হিংসা, যুক্তি সহ, জনগন যখনকোন অন্যায়ের প্রতিবাদে উঠে দাঁড়ায়, রাষ্ট্রও তো হিংসারই আশ্রয় নেয়। বলা হয় ভারত রাষ্ট্র অহিংস। কিন্তু এ অহিংস দেশে প্রতি বছর কত গুলি চলে, ধর্মান্ধরা কত মৃত্যু ঘটায়?রাষ্ট্র ব্যবস্থা যখন ব্যর্থ, তখন বিচারের জন্য ব্যক্তির হিংসা বা যে কোন উপায় গ্রহনের অধিকার আছে, ব্যক্তি মানুষনিরবে যন্ত্রনা সয়ে যেতে পারে না। তসিলদার মূলস্রোতের প্রতিনীধি। সে ঠিকাদার, তার পিছনে আছে সমগ্র প্রশাসন তন্ত্র, ...আজকের ভারতে যা সত্য তেমনি সব ঘটনাই আমি মেরী ওঁরাওয়ের কাহিনির মাধ্যমে বলছি। নিজেকে তো ভারতীয় লেখকই ভাবি শুধু বাঙালী লেখক নয়।....."[৪৯]

সুতরাং মেরীর দেওয়া শাস্তি যে প্রাসঙ্গিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মেরী ওঁরাও সমস্ত আদিবাসী নারী সমাজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রতিবাদ এবং সংঘাতকে নিজের অজ্ঞাত সারেই প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে গোটা নারী সমাজের সামাজিক অস্তিত্বকে

টিকিয়ে রাখার মাধ্যমকে আরও বেশি প্রখর ও দৃঢ় করে গোটা ভারতবর্ষের পুরুষ তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পর্দাহীন উলঙ্গ রূপটিকে দেখিয়ে দিয়েছে।

‘শাস্তি’

প্রথম প্রকাশ : ভারতবর্ষ, ৪৮ বর্ষ, ২য় খন্ড, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৬৭ / ১৯৬০

মহাশ্বেতা দেবীর সমাজ সমস্যা মূলক ছোটগল্প গুলির মধ্যে ‘শাস্তি’ গল্পটিও একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যার গল্প। এই গল্পে প্রধান চরিত্র দুটি হল, অমর এবং চারুলতা। চারুলতা দরিদ্র শ্রেণির প্রতিভূ হিসেবে গল্পে উঠে আসে। তৎসঙ্গে সমাজের বেকার সমস্যার দিকটিও ফুটে ওঠে। এই গল্পে দেখানো হয়েছে একজন দরিদ্র ঘরের মেয়ে নিজের সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করেও এ অবস্থা থেকে নিজেকে উপরে ওঠাতে পারে না। এবং অবশেষে পতিতা বৃত্তি গ্রহন করতে বাধ্য হয়।

অমর উচ্চশ্রেণির শিক্ষিত ভদ্র, সুচতুর সরকারী চাকরিজীবি ভদ্র ছেলে। তার দু:সম্পর্কের বোন চারুলতা। আর এই সম্পর্কের খাতিরেই চারুলতা বার বার অমলের কাছে কাজের সন্ধান দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু বার বার ব্যর্থ হয় চারুলতা। তথাপি নিজের কাজের জন্য চারুলতা আবার আসে অমরের কাছে তার সই নেবার জন্য। সেখানেও চারু ব্যর্থ হয়। যে চারু নিজের মান-ইজ্জত, মর্যাদা, পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য রাখালের সঙ্গে কাজে যায় না। গ্রাম্য ঘরোয়া মেয়ে নিজেকে মানিয়ে নেয়, কষ্ট করে চলে তথাপি নিজেকে রেন্ডি করে দেয় না। অবশেষে সেই চারুই হোটেলের কেবিনের নাম করা বেশ্যায় পরিনত করে নিজেকে। যে মেয়ে লাজুক, নিজের মাথা তুলে পর্যন্ত কোন পুরুষ মানুষের সঙ্গে বা অপরিচিত কোন লোকের সামনে দাঁড়াত না। সেই মেয়েই হোটেলের কেবিনে ধরা পরে যায় বেশ্যা বৃত্তি করার জন্য। এবং হোটেলের উচু তলা থেকে নামার পথে লজ্জাহীন নির্লজ্জ ভাবে চিৎকার করে এবং পুলিশকে বলে,

> "লেকচার মারবেন না। যারা টাকা দেয়, তাদের তো তুলবেন না। তুলবেন আমাকেই।"[৫০]

চারুলতা সমাজকে, বুঝতে শিখেছে, বুঝেছে প্রশাসনকেও। সে কথা বলতে শিখেছে, লজ্জাকে ভুলে গেছে, তাই তো নিজের অজান্তেই গোটা ভারতবর্ষের পুলিশ প্রশাসনের আসল চেহাড়াটাকেও বাইরে প্রকাশ করে। সরকারকে, প্রশাসনকে টাকা দিলে পুলিশের নিরাপত্তায় অপরাধ ঘটতে পারে। আর টাকা না দিলেই সে নারী অপরাধী মূলক ব্যবসায় মত্ত। কেননা যে হোটেলে চারুলতা ধরা পরে সেখানে সাঁতটি নারীর কেবিন। কিন্তু যারা টাকা দেয় (ঘুষ) তারা ধরা পরে না। আর যারা টাকা দেয় না তারাই ধরা পরে। অপরদিকে চারুলতার প্রতিবাদ প্রখড় হয় অমরকে বলা কথার মধ্যদিয়ে। যে অমর একদিন একটি সই করে দিলে চারুলতা কাজ পেয়ে যেত। সে চারুলতা এখন একজন বেশ্যা। তাইতো হোটেল ভর্তি লোকজন এবং অমরের ভদ্র বন্ধুর সম্মুখেই চারুলতা অমরকে বলে,-

"আপনি?

বারসুদ্ধ লোক তাকায়। অমর মিশে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে ! এখন ওকে কে বাঁচাবে। সাব ইন্সপেক্টর বলেন – চেনো নাকি অ্যাঁ?

চারুলতা অমরের দিকে চেয়েই থাকে। অমরের মুখ সাদা হয়ে যায়। ও ঘামতে থাকে।

চিনি না। চিনি বই কী! কী অমর বাবু, তোমাকে চিনি, না চিনি না?

চারুলতা!

চারু নয়। লতা। দেখ! সেদিন যদি চাকরিটা দিতে। লাইনে নামতাম কি?

চারুলতা?

না। আমি ..... আমি .....

চারুলতা বলে – পকেটে পয়সা থাকলে আসবেন! কেমন? চলুন দারোগা বাবু, আপনার পাওনা গন্ডা মিটিয়ে আবার আসবো তো!

যেতে যেতে বলে – চলি গো অমর বাবু।

অমর বুঝতে পারে ওর মাথা ঘুরেছে, শিরে রক্তের চাপ, ও ভেঙে পরছে হুড়মুড়িয়ে।

ও নিজেকে যা ভাবতো, ও যে তা নয়, তা জানার শাস্তিটা তো জাবজ্জীবন চলবে। তারপর ও কি করবে? আত্ম হত্যা?"[৫১]

চারুলতা সমাজের সরকারী কর্মচারী, দায়িত্ববান ভদ্রলোক অমর বাবুর বিরুদ্ধে কোন ক্ষমতাধারি উচ্চ শ্রেণির মানুষের বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করে নি। কিন্তু ব্যঙ্গ রসিকতার মাধ্যমে সর্ব সম্মুখে নিজের বাস্তব চেহারাটাকে শুধুমাত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে অমরের কাছে। আর তাতেই সমাজের ক্ষমতাধারী এবং নিজেকে মহান ভাবার মতো ব্যক্তি বর্গকে মহাশ্বেতা যেন চাবুক মেরেছেন। শুধু লতাই নয়, লতার মতো আরও বহু লতা রয়েছে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। সেখানেও ক্ষমতা ধারী মানুষের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সাধারণ ভুলের জন্য বহু যুবক যুবতীর প্রান বিসর্জন হয়। আবার অনেক বেকার অসহায় অর্ধ শিক্ষিত মেয়েরা অর্থের জন্য পতিতা বৃত্তি করতে বাধ্য হয়। মহাশ্বেতা লতার মধ্যদিয়ে গোটা ভারতীয় সমাজে বসবাসকারী সেই নিম্ন-শ্রেণির দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মেয়েদের জীবনচিত্রকেই তুলে ধরেছেন 'শাস্তি' গল্পের মধ্যদিয়ে।

'চম্পা'

প্রথম প্রকাশের স্থানকাল অজ্ঞাত, পুনরমুদ্রন ; মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠগল্প, -১৯৮৪

চম্পা গল্পটিতে মহাশ্বেতা দেখিয়ে ছেন বিদেশী কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থার নিষ্ঠুরতার নির্মম বর্বরতা। অসহায় নির্দোষী ন্যায় পরায়ন পরিবারের তিনজন সদস্য হরচান্দ, ব্রীজলাল এবং চম্পা। চম্পা তার স্বামী ব্রীজলাল এবং দাদু হরচান্দকে নিয়ে সুখেই দিন যাপন করতো। ক্যান্টনমেন্টের সাহেবের বিবি চম্পাকে ভীষণ ভালো বাসতো, স্নেহ করত। তাই

শেরিডান সাহেবের বিবি দেশে ফিরে যাবার সময় তাকে স্নেহ বসত তার ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে তাকে মোরাদাবাদের পেতলের কাজ করা এক বাস্কেট থরে থরে সূচ সাঁজানো বস্তুটি চম্পাকে উপহার হিসেবে দেয়। সঙ্গে থাকে নানা রঙের সূতো, বোতাম সাজানো এবং দিল্লির রেজিমেন্টের চ্যারিটি ফেয়ার পরিচালনায় পারদর্শিতার জন্য ক্লাবের তরফ থেকে অল্প বয়সে পাওয়া একটি রূপোর মেডেল। শেরিডান সাহেব অসুস্থ হন, যার ফলে আর তাদের দেশে যাওয়া হয় না। পরবর্তি সময়ে সিপাহী বিদ্রোহের যুদ্ধে শেরিডান সাহেব অসুস্ত হন, আর তাদের দেশে যাওয়া হয় না। পরবর্তিতে সিপাহী বিদ্রোহের যদ্ধে শেরিডান সাহেব ও তার স্ত্রী মারা যান। সেই স্থানে চলে আসেন শেরিডান সাহেবের ভাইপো এভারেট। এভারেট চম্পার ঘরের দেওয়ালে তার কাকিমার দেওয়া বস্তু সামগ্রি দেখে ভাবেন এসব লুটকরা মাল। এবং এইভাবনায় ভাবিত হয়ে চম্পার স্বামী ব্রীজলালকে ও তার দাদু হরচান্দকে ফাঁসি দেন।

স্বামী ও দাদুকে হারিয়ে চম্পা একা হয়ে যায়। সে এই একাকিত্বের জীবন যাপন করতে পারে নি। সে বুঝতে পেরেছে প্রিয়জন হারানোর ব্যথা বেদনা কতটা গভীর হয়। নিজের প্রিয়জনের মৃত্যুতে তাদের সৎকার করতে পারেনি। তাইতো এভারেট ভুলে গেলেও চম্পা ভুলতে পারেনি। প্রতিবাদের আগুনে জ্বলে উঠে চম্পা। চম্পা বুঝতে পারে শুধুমাত্র শক্তি দিয়ে তাদের সঙ্গে পাওয়া যাবে না। তাইতো সে বুদ্ধির প্রয়োগ করে।

> "সন্ধের সময় গাঁয়ের অদূরে ঝোপের মধ্যে ঝুড়ি বোঝাইবোতল বোতল দেশি মদ পাওয়া গিয়েছে। বয়াল বিহীনএকটা গাড়িতে মদের বোতল গুলো নিয়ে বসেছিল একটিমেয়ে। ..... ধরা পড়তে দাঁতে একটা ছোরা কামরে ধরে,হাতে পিস্তল নিয়ে লড়তে এসেছিল। .....শিখ সিপাহীদেরসঙ্গে সে ঝগড়া করতে করতে এল। বেতের গাছের মতো ছিপ ছিপে শরীর। ফুঁস ফুঁসে উঠছিল রাগে। পুরুষ গুলোকে পেছনে রেখে রানীর মতো সগর্বে নিজেই আসছিল আগে আগে। সে তাদের মালিক, এমনি ভাব খানা।

> সাহেবের কাছে এসে মাটিতে শুয়ে পড়ল ছেলাম জানিয়ে। ভালো অভিনয় জানে। বিনয় ও ভয়ে শঙ্কুচিত হয়ে ছোটছোট কথায় জানাল যে মদের বোতল গুলো কোম্পানীর সাহেবের সেবায় ছেড়ে দিয়ে সে চলে যেতে চায়। দাম সে চায় না।”[৫২]

সুপরিকল্পিত ভাবে চম্পা ঝুড়ি বোঝাই মদের বোতলে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে ম্যাক্সোয়েল বাহিনীর কাছে ধরা দেয়। এবং কৌশলে মদের বোতল ছেড়ে দিয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করে। পরবর্তীতে সেনা বিভাগের প্রধান তা বুঝতে পারে এবং চম্পাকে ধরার নির্দেশ দেন। চম্পা ধরা পরে রাতে যমুনার ঘাটে। তার এলোমেল চুল হাত দুটো পেছনে বাঁধা, ক্ষত-বিক্ষত পা। অনেক জেরা করেও চম্পার মুখ থেকে তার সঙ্গী সাথির নাম বের করতে পারেনি। বরং নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে প্রতিবাদের প্রখর ভাষায় এভারেট সাহেবকে বলেছে,

> “সাহেব তোমরা বেইমানি করেছ ..... সাহেব কোনদিনযদি তালাস করে জানতে পারো জানবে কানপুরের বুড়ো শেরিডানের বিবি আমাকে কতগুলো জিনিসদিয়েছিল ভালোবেসে। তাকে লুটের মাল বলে জাহিরকরল সাহেব, শেরিডানের ভাতিজা। ..... আমার বুড়ো দাদা আর আমার স্বামীকে ফাঁসিতে লটকে দিলে তোমরা।ফাঁসে মরল বলে তাদের চৌথা ক্রিয়া কিছু হল না।.....গলা ভেঙে যায় তবু চম্পা বলে, আপশোস যে তোমাদের কার জান নিতে পারলাম না। ধাক্কা দিতে থাকে দুজন সিপাহী। বিস্রস্ত চুল বাতাসে উড়ে ঝাপটায় চোখে মুখে কপালে। প্রত্যেকের মুখ কিছুক্ষন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেখে। সমস্ত জমায়েতটার প্রতি। থুথু ফেলে চম্পা বলে, সব বে হিম্মত,কাপুরুষ।”[৫৩]

চম্পা প্রতিশোধ নিতে ব্যর্থ হয় ঠিকই কিন্তু তা যেন আপাত ব্যর্থতা। কেননা একজন সামান্য অসহায় রমনী যখন একটা গোটা সামরিক শক্তিকে, তার অন্যায়কে শাস্তি দেওয়ার পরিকল্পনা নেয় এবং সমস্ত পুরুষ সৈন্যকে 'কাপুরুষ' বলে ধিক্কার জানায় তখন আর হার-জিতের কোন প্রশ্নই থাকে না। তার সাহসই প্রতিবাদ হয়ে ফুঁটে উটে। এবং চম্পা সেই কাজটি করেছে।

সামরিক সৈন্যের হাতেই চম্পার মৃত্যু হয়। মৃত শবকে নিয়ে কারাকারি করে শেয়াল কুকুর। তার সঙ্গিরা চম্পাকে খুঁজে বের করে ও কবর দেয় এবং বিদ্রোহী সংগ্রামী প্রানকে তারা কপাল ঠেকিয়ে সেলাম জানায়। চম্পা মৃত্যু বরণ করে কিন্তু তার কোন সঙ্গির নাম বলেনি। তাদের কোন গোপন শক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকলেও তার কোন সন্ধান দেয়নি। একটি মহৎ বিদ্রোহী নেতার যে গুনাবলি গুলি থাকা নিতান্তই প্রয়োজন, সেগুলি যথাযথ ভাবে বজায় ছিল চম্পার মধ্যে।

বস্তুত মহাশ্বেতা দেবী পরাধীন ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতাপকে অনুভব করতে পেরেছিলেন। এদেশীয় সম্পদ লুণ্ঠনের চেয়েও ভয়াবহ ছিল এদেশের সাধারন অসহায় মানুষকে আক্রমন। এই অনুভূতির কারনেই মহাশ্বেতা চম্পার মতো গল্প রচনা করেন। এই ঔপনিবেশিকতার শোষন, লুণ্ঠন, ও অত্যাচারের রূপচিত্র বর্ণনা করতে গিয়েই চম্পা নামক বিদ্রোহী এক নারী চরিত্র নির্মান করেন তিনি। চম্পা এমনই এক নারী চরিত্র যে, বিনা দোষে প্রিয় জনের মৃত্যু দন্ড তার জীবনে শোকের ছায়া বহন করতে পারেনি। চোখের জলে ভেসে যায়নি, নীরবে একাকিত্ব বিরহ বেদনার দিন যাপন করার কথা সে ভাবেনি। বরং প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে উঠেছে তার হৃদয়। চম্পা প্রতিবাদে নেমে পরে। তার সংঘাতই বলে দেয় যে মারের বদল মার এবং মৃত্যুর বদল মৃত্যু। চম্পা যদিও মৃত্যু বরণ করে তথাপি সিপাহী ভর্তি শিবিরের বুকে ঘৃনা ভরা থুথু ফেলতে তার কোন দ্বিধাবোধ হয় নি। মৃত্যুকে সামনে দেখেও তাদের কাপুরুষতাকে বিদ্ধ করে গেছে ঘৃনায়। আর

তখনই চম্পার প্রতিবাদ শুধুমাত্র প্রতিবাদ হয়েই থেমে থাকে না অজ্ঞাত সারেই সে নারী যেন রাষ্ট্রীয় সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে হয়ে ওঠে প্রতিবাদের জ্বলন্ত শিখা।

‘রোমথা’

‘রোমথা’ গল্পে রাজা লক্ষ্মন সেনের আমলের রোমথা প্রথাকে লঘু করে মানব জাতির বেঁচে থাকার এবং জীবনকে সংশোধন করার এক প্রতিবাদী কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। গল্পের মূল বিষয় চন্দ্রাকে মেরে ফেলার দায়ে শরনের মৃত্যু দন্ড। এবং সে দন্ড অনুযায়ী

কবিরাজ জীবিত শরনকে তপ্ত গরম তেলে ছেড়ে দিয়ে মহামাস তেল তৈরি করবে। যা অসুস্থ মানুষের চিকিৎসার জন্য উপকারী আবার অপরদিকে রাজার অর্থ উপার্জনের একটা বড় মাধ্যম, সে কারনে শরন হয়ে ওঠে রোমথা প্রথার শিকার। এই গল্পে মহাশ্বেতা রোমথা প্রথার সক্রিয় রূপকে দেখাতে সমর্থন হলেও চন্দ্রাবলী এবং সুভদ্রা নামক দুটি নারী চরিত্রও স্বতন্ত্র ভাবে পাঠক মহলের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চন্দ্রা গৌর নগরির নাম করা গনিকা, বর্তমানে বয়স মধ্য গগনে উপস্থিত তাই সে এখন গনিকা বৃত্তি করে না। তার অনুগামি কম বয়সের গনিকাদের গনিকা বৃত্তিতে, জীবিকা নির্বাহ করার সমস্ত কৌশল প্রদান করে। চন্দ্রাবলীর এই অর্ধ বয়সের একমাত্র খরিদ্দার হল শরন। সে শরনকে ভালোও বাসে। শরনও চন্দ্রাকে ভীষন ভালো বাসে। এই প্রেম ভালোবাসার পবিত্র সম্পর্কের মধ্যে গভীরতা এতটাই বেশি পরিমানে ছিল যে, চন্দ্রাবলী শুধুমাত্র শরনের জন্যেই তার ঘরের দরজা খোলা রাখত। দ্বিতীয় আর কোন পুরুষকেই কোন কিছুর বিনিময়ে ঘরে ঢোকাত না। কিন্তু নগর রক্ষীর সেনা প্রধান গোপাল এদের পবিত্র সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দেয়। ক্ষমতার বলে গোপাল এক রাতের জন্য চন্দ্রাবলীকে ব্যবহার করে, আর শরন তা সহ্য করতে না পেরে হাসি মুখে চন্দ্রাবলীকে গলা টিপে মেরে ফেলে। চন্দ্রাবলী গোপালকে বারন করতে পারে না। কারণ সে রাজা লক্ষন সেনের রাজ সৈনিক, তার চোখে খারাপ হলে রাজ রোষে পড়তে হবে। মিথ্যে সমস্যায় ফেলে চন্দ্রাকে নগর থেকে বের করে দিবে, নইলে হাত পা বেঁধে ক্রীতদাসদের মধ্যে ফেলে দিবে। চন্দ্রাবলী মন থেকে গোপালকে মেনে নিতে পারে না। তার মৃত্যু কামনা করে। এবং নিজের প্রেমিককে ফাঁকি দেওয়ার জন্য সে প্রেমিকের হাতেই মৃত্যু বরণ করে। এই মৃত্যুর কারনেই শরনের মৃত্যু দন্ড হয় এবং রোমথা প্রথার শিকার হয় শরন।

আবার সুভদ্রার কাহিনি চন্দ্রাবলীর কাহিনির থেকে পুরোপুরি বিপরীত ধর্মী। সুভদ্রা শরনের দ্বিতীয় প্রণয়ী। খুব কম বয়সে বাল্য বিধবা হয়ে পিতা চন্দ্র সেনের কাছেই জীবন যাপন করছে। সুভদ্রা সুন্দরী, সুন্দর শরীরের গঠন, সাস্থ্য সুঠাম, ভরা যৌবন তার তা

সত্ত্বেও বুকে পাথর চাপাদিয়ে পিতার কুল ধর্ম রক্ষার জন্য বহুদিন নীরবে চেপে রেখেছে রেখেছে নিজের জৈবিক চাহিদা গুলিকে। কিন্তু রোমথা শরনকে দেখার পর তার সমস্ত কিছু উলট-পালট হয়ে যায়। শরনের প্রেমে পরে যায়। শরনের জন্য পিতার কুলে কালি দিয়ে রোমথার সঙ্গে বেরতে তার এতটুকু দ্বিধা নেই। তাই তো সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, কূল, পরম্পরাকে সে মুল্যহীন করে দেয় নিজের জীবনের প্রনয়ের কাছে। ভয় ভীতি কোন কিছুই সুভদ্রাকে ছুঁতে পর্যন্ত পারে না।

> "শরনকে ভালো বাসার পর থেকে তার ভয় গিয়েছে, ডরগিয়েছে। লাজ লজ্জা বলতে কোন কিছুই রাখেনি। শুধু আছে একটা দেহমন জোড়া কামনা।"[৫৪]

তাইতো জল নিয়ে আসার ছলে মা বাবাকে ফাঁকি দিয়ে সুভদ্রা অথৈ সাগরে যাত্রা করে। গভীর রাত্রে শরনের উদ্দেশ্যে। সুভদ্রা নিজেই শরনকে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা এবং সুযোগ করে দেয়। সুভদ্রা চলে সেই দেশে যেখানে বৈদ্যদের অত্যাচার নেই, যে দেশে লক্ষণ সেনের মতো কোন রাজা নেই, যে দেশের মানুষ রোমথাকে চিনতে পারবে না, সেই উদ্দেশ্যেই সুভদ্রা যাত্রা করবে শরনকে নিয়ে। সে শরনকে ভালো বাসে, তার ভালো বাসার জন্যে সুভদ্রা সব কিছুই করতে রাজি আছে। তাই সুভদ্রা মনে করে শরন যেন বেশ্যা হত্যা করেনি। সে ভালো মানুষ। তাই তো তার উদ্দেশ্যেই এই নিরুদ্দেশ অভিযান। তাছাড়া বিধবা মেয়ের জীবন মানে এক খোলা মুক্ত আকাশেও এক ধরনের বন্দী জীবন যাপন। এই জীবনের প্রতি সুভদ্রার ঘৃনা এসে গেছে। সে পালিয়ে যাবে। রোমথা ছাড়া সমাজের কোন নব জোয়ান পুরুষ সুভদ্রাকে বিয়ে করবে না। সমাজ নারীদের জীবন ধারণ পদ্ধতি ঠিক করে দিয়েছে। বিধবাদের জন্যও বিধি রয়েছে বন্দী জীবন-যাপন করার। সেই বিধি মতেই সারাজীবন কাটাতে হবে সুভদ্রাকে। তাই তো সুভদ্রার এই পরিকল্পনা। যা সামাজিক বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে শুধু মাত্র পরিকল্পনাই নয় পরিনত হয় বিদ্রোহে। এই বিদ্রোহ আরও বেশি প্রখর হয় শরন যখন রাতের অন্ধকারে দুজনে পালিয়ে যাওয়ার কথা যে নৌকায় উঠে, সে নৌকা না দেখার কারনে।

শরনও সুভদ্রাকে ফাঁকি দেয়। সে শুধুমাত্র নিজের কথাই ভাবে স্বার্থপরের মতো, সুভদ্রার কথা শরন একবারও মনে করেনি। সুভদ্রার সঙ্গে শুধুমাত্র ভালো বাসার নাটক করেছে শরন নিজেকে বাঁচানোর জন্য। গল্পকার নিজেও সে কথাই বর্ণনা করেছেন,-

> "শরন তো তাকে ঠকিয়েছে তার লজ্জাটি কেড়ে নিয়েছে। তাকে মিথ্যাদিয়ে বশকরে নিজে পালাবার ব্যবস্থা করেনিয়েছে। সুভদ্রার মনে হল শরনই তাকে বিবস্ত্র করে পথে ছেড়ে দিয়েছে। এখন শরনকে হাতে পেলে সে টুকরো টুকরো করে ছিড়তে পারে, হাসতে হাসতে শরনকে নিজ হাতে জ্বলন্ত তেলের মধ্যে ফেলতে পারে।"[৫৫]

শরণ পরবর্তীকালে ধরা পরে এবং তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু সুভদ্রাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি শরন পুরন করতে পারে না। শরন হয়তো বা মৃত্যুর অতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে সুভদ্রার অপেক্ষা না করেই ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু সুভদ্রাকেও তার প্রতিবাদ জনিত ক্ষোভের জন্য আমরা দায়ি করতে পারি না। কেননা একজন নারী যখন কোনো পুরুষের দ্বারা প্ররোচিত হয়, প্রবঞ্চিত হয় তখন এই প্রতিবাদ বা সংঘাতের প্রলাপ অজ্ঞাত সারেই বেড়িয়ে আসে। তাই তো আমরা 'রোমথা' গল্পের কাহিনিতে একটি প্রথার বর্ণনার। পাশাপাশি আমরা দেখেছি নারী চরিত্র গুলিও সক্রীয় হয়ে ওঠে সমাজ বাস্তবতার গোটা রূপকে সঙ্গে নিয়ে। এবং নারীর নিজস্ব স্বতন্ত্র মৌলিক দিক গুলিকে সর্বোসম্মুখে বিস্থার করে দেয়।

'সতী রানির ঘাট'

মহাশ্বেতা দেবী প্রবাসী বাঙালী শশাঙ্কের স্বপ্নের মধ্যদিয়ে সতী নামক একটি নারীর জীবনের অপূর্ণতাকে তুলে ধরেছেন। একই সঙ্গে ফুঁটে ওঠে জমিদারের ক্ষমতা নিতীর

প্রয়োগ ও পুরুষ তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার গ্যাড়াকলে নারীর সহমৃতা হওয়ার সামাজিক চালচিত্রের কথা।

গল্পে দেখানো হয়েছে মুর্শিদাবাদের জমিদার প্রতাপ রুদ্র রায়, বিশাল ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিপত্তিশালী মানুষ। প্রতাপ রুদ্র রায়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী তাঁর বিমাতা ভাইপো ভবানি শঙ্কর। জলঙ্গিতে জমিকেনার জন্য এসে সাক্ষাৎ হয় সতীর সঙ্গে। সতী গরীব ব্রাহ্মনের কুলিন ও অবিবাহিত মেয়ে। তাকে দেখে ভবানীর ভালো লেগে যায় এবং উভয়ে প্রেমের সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। অবশেষে ভবানীর কাকা মশায় প্রতাপরুদ্র ভাইপো ভবানীর জন্য সতীকে দেখতে যায় এবং সতীর রূপ সৌন্দর্য ও গুনাবলী দেখে প্রতাপ নিজেই পাগল হয়ে যায়। ভাইপো ভবানীর কথা এবং নিজের কন্যার সমতুল্য মেয়ের থেকেও কম বয়সী সতীকে জমিদার প্রতাপ নিজেই বিয়ে করে বসে। ভাবতে অবাক লাগে প্রতাপ রুদ্রের ঘরে তিন জন সুন্দরী রূপসী পতিব্রতা স্ত্রী বর্তমান থাকার পরও চতুর্থ বার বিয়ে করে সতীকে।

সতী প্রত্যক্ষভাবে প্রতাপ রুদ্রের কর্মের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানায় না। কারন সে নারী। কিন্তু নীরবতার মধ্যদিয়ে প্রতি মুহুর্তে জমিদার প্রতাপকে যেন চাবুক মারতে থাকে। প্রতাপের স্ত্রী হয়েও নিজেকে কখনো পিতার বয়সী জমিদারের প্রতাপের স্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে পারে না। সর্বোদাই ভবানীর চিন্তা ভাবনায় মত্ত থাকে। তাইতো অবশেষে নিজে ভবানীর সঙ্গে প্রতি নিয়ত রাতের অন্ধকারে পুকুর পারে জঙ্গল-ঝারে সাক্ষাৎ করে। তারা পরস্পর বিয়ের প্রকৃত রূপকে স্বীকার করে বলে,

> ‘এ বিয়ে আমি মানি না। সেই বিলের ধার। জলে দাঁড়িয়ে দুজনে দুজনকে কথা দিয়েছি, সেই আমাদের বিয়ে। এই অনাচার মানি না।’[৫৬]

এই সাহস সতীকে গড়ে তুলে সংগ্রামী নারীতে। সে এখন আর ভয় পায় না ভবানীর সঙ্গে অজানা দেশে পারি দিতে। কেননা সতী এখন সমাজকে, সংস্কৃতিকে, ধর্মকে, রাজ ঐশ্বর্য্যকে এবং প্রতাপ রুদ্র রায়ের ক্ষমতাকে ভয় পায় না। তাই তো পালিয়ে গিয়ে ভবানীর সঙ্গে জীবন কাটাতে তার কোন অসুবিধা নেই। সতী এখানে যে নীরব প্রতিবাদকে জারি রাখে। প্রতাপ রুদ্রের কথাই শেষ কথা সমাজের সমস্ত নাগরীকদের জন্য। যার কথায় বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। তার বিরুদ্ধেও চলে যায় সতী। সামাজিক নিয়মে যখন কোন নারী বা মেয়ে কোন পুরুষের সহধর্মীনি হয় তখন থেকে তার স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত তাকে এই সম্পর্কের ভার বইতে হয় অর্থহীন ভাবে। এবং মৃত্যুর পর স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় সহমৃতা হতে হয়। সেই সামাজিক নিয়মকে উপেক্ষা করে সতী ভবানীর সঙ্গে পালিয়ে যেতে রাজি হয়। সতী তাই একই সঙ্গে লড়াই করেছে দুটি শক্তির বিরুদ্ধে। এক . স্বামীর প্রতাপের বিরুদ্ধে, দুই . সামাজিক বিধি নিয়মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। যদিও সতী সহমৃতা হয় প্রতাপ রুদ্রের সঙ্গে তবে পরবর্তী সময়ের নারী সমাজের প্রতি প্রতিবাদের সুরটি পৌঁচ্ছে দিয়ে যায়।

বস্তুত, মহাশ্বেতা দেবী দেখাতে চেয়েছেন সামাজিক কুসংস্কারের ফলে যেখানে রুদ্র প্রতাপের মতো জমিদারদের তিনটি স্ত্রী থাকার সত্ত্বেও আবার বিয়ের প্রয়োজন হয়। ধারাবাহিক ভাবে চলে আসা প্রথম স্ত্রীর সহমৃতা হওয়ার নিয়মকে ভঙ্গ করে। শেষতম স্ত্রী অর্থাৎ ছোট বৌ সতীকে সহমৃতা করে প্রতাপ রুদ্র ক্ষমতা পরায়ন নীতির দ্বারা। এখানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নীতি ক্ষমতার কাছে পরাজিত হয়। আসলে নারীকে পুরুষের মতের উপর নির্ভরশীল হতে হবে এটাই বড় কথা। নারীর ব্যক্তি মর্যাদা, নিজস্বতা বলে কিছু না থাকাটাই মূল সংস্কৃতি। মহাশ্বেতা এই অনিয়ম, ক্ষমতা অপব্যবহার, কুসংস্কার এবং গোঁড়ামীর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জনিত কারনে 'সতীরানির ঘাট' গল্পটি নির্মান করেন। েবং সতীর সহ মরনের মধ্যদিয়ে নারী জীবনের অসহায়তার দিকটিকে ফুটিয়ে তুলেন।

‘মায়ের মূর্তি’

প্রথম প্রকাশ : শারদীয় অমৃত ১৩৭৮/১৯৮০ খ্রী.

'মায়ের মূর্তি' গল্পে মহাশ্বেতা দেবী তেভাগা আন্দোলনের গোটা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক চিত্রকে ফুঁটিয়ে তুলেছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন গোটা ভারতবর্ষের সরকারী প্রশাসনিক শাসন ব্যবস্থার শোষন, পীড়নের চরম মাত্রাকে। একই সঙ্গে তুলে ধরেছেন দরিদ্র অন্ত্যজ শ্রেণির সাধারন মানুষকে মেরে ফেলার, শাসন করার, শোষণ করার এবং গরীব শ্রেণির কৃষক ও মজুরের ফসল বল পূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়ার বর্বরতার দিক গুলিকে। এই আন্দোলনের প্রকৃত রূপ ফুঁটে ওঠে 'মায়ের মূর্তি' গল্পে। গল্পে দেখানো হয়েছে সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থপরতার মূল বিষয় গুলি। সব ধরনের রাজনৈতিক নেতারাই নিজের স্বার্থ বুঝে কাজ করে। সাধারন মানুষের কথা কেউ ভাবে না। সাধারন মানুষকে, অন্ত্যজ শ্রেণির ভূখি, অনাহারক্লিষ্ট সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক নেতারা শুধুমাত্র ভোট গ্রহনের সময়েই মনে করে। এই দিকটিই উঠে আসে এই গল্পে। পাশাপাশি একজন প্রতিবাদী প্রত্যক্ষ আন্দোলনে যোগদানকারী বীর যোদ্ধা নারী চরিত্র কৌশল্যাকে দেখা যায়। যিনি তেভাগা আন্দোলনের একজন অন্যতম নেত্রী। শুধু কৌশল্যাই নয়, দূর্গামনি, রাইমনি, কৌশল্যা, অন্নপূর্ণা এরা প্রত্যকেই গরীব চাষীর কন্যা আবার একই সঙ্গে গরীব কৃষক ঘরের বধূ। প্রত্যক্ষভাবে তেভাগা আন্দোলনে যোগদিয়ে সংগ্রাম করে। পুলিশ প্রশাসন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রান হারিয়েছে এরা প্রত্যেকেই। তেভাগা আন্দোলনে শুধু পুরুষরাই নয় নারীরাও সমানভাবে দক্ষতা দেখিয়েছে, নিজের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে। এই দূর্গামনির লড়াই এবং মৃত্যুর কথা এই গল্পে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

> "স্বাধীনতার পর মাত্র দেড় বছর কেটেছে কি কাটে নি। দূর্গামনি দা মেরেছিল পুলিশের হাতে, তারপর দূর্গামনি আররাই মনি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশের দাড়োগার উপর। দুজনের হাতেই দা ছিল তখনও কিন্তু দাড়োগার ওপর থেকেতাদের ঠেলে না সড়িয়ে পিছন থেকে গুলি করেছিলপুলিশ।দূর্গামনির কোলের ছেলে ওই পদ্মর কাছে। পদ্মর একহাতে দা, আর এক হাতে ছেলে। পদ্মর আকাশচেরা চিৎকার, দেব না, নাশ নিতে দেব না কারো।"[৫৭]

নারীরাও যে, কোন কিছুতেই পিছিয়ে নেই মহাশ্বেতা সে কথাই বর্ণনা করেছেন 'মায়ের মূর্তি' গল্পে। জোতদার, মহাজন, জমিদার, প্রভৃতিদের শোষনের এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধেই এদের প্রতিবাদ। এই নিম্ন শ্রেণির মানুষেরা অভাবের তাড়নায় ভাত খেতে পারে না। কচু, ঘেটু, পাতা, জঙ্গলের ফল মূল, আলু, কাউন, মারোয়া খেয়ে জীবন যাপন করে। এই আন্দোলনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে কৌশল্যা বলে,

> "কৌশল্যা তো তখন ভরামাস পূর্ণগর্ভা। এই দলমলে চেহারা, ধানকাটে শক্তহাতে মোটাগোছে। কাস্তে তুলে সে ঘোরাচ্ছে, এক হাতে স্বামীর মাথা ধরে রেখেছে সামনে ঢালের মতন, আয় শুয়োর ব্যাটারা, ঢ্যামনা বেজন্মার পাল, জোতদার দের মদত দিয়ে ঝাবি কত কাল ? তোদের ঘরে জমি নি ? জমি কেড়ে নিলে বুকির যদ্যি নাঙল চলি ঝায় জানিস নি ? হা রে শোঁয়ারের শুগনির পাল। ঘরে মা বুন নি তোদের ? মা বুনের উপর গুলি চালাচ্চিস?"[৫৮]

কৌশল্যারা শক্তহাতে কাজ করে। ধানকাটে, চাষ করে, ক্ষেত বুনে এরা নিজেকে কখনই নারী মনে করে না। কেননা এদের মধ্যে নারী পুরুষের কোন বৈষম্য নেই, তাই তো পুরুষের সঙ্গে হাতে হাত, পায়ে পা মিলিয়ে সব কাজে সহযোগিতা করে। আর সে কারনেই শুধু কাজেই নয়, লড়াইয়েও পুরুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এরাও হাতে যে যা পায় দা, কাটারি, হাসুয়া, কাস্তে, বল্লম, হাতুরি প্রভৃতি হাতিয়ার গুলোকে সঙ্গে নিয়ে সরকারী কর্মচারি, পুলিশ প্রশাসন, জোতদারের লোক জন, এবং জমির বেওয়ারিশ মালিকের ধ্বংসাত্মক নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে। এদের লড়াই তাদের বিরুদ্ধে, যারা এদের পরিশ্রমে বোনা ফসল ঘরে উঠাতে দেয় না। যারা এদের ফসলকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। যারা এদের ফসলকে এদের অধিকারের বলে মনে করে না। এদের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় জয়চাঁদ। যে জয়চাঁদ এই তেভাগার লড়াইয়ে নিজেকে শেষ করে দেয়। সেই জয়চাঁদই এদের আন্দোলনের জন্মগুরু। গুরু জয়চাঁদকে কৌশল্যার ছেলে আজও শ্রদ্ধা করে।

জগাইয়ের মনে পরে যায় সেই দিনের সেই তেভাগার আন্দোলনে কৌশল্যার মৃত্যু বরণের দিন গুলি। জগাই বর্ণনা করে সেই দিনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা,-

> "সেই জয়চাঁদ, কৌশল্যার সেই অক্ষয় মানুষ মরে গেছে।কৌশল্যা তখন রনরঙ্গিনী। সে তখন তেভাগার সঙ্গে এক। ছেলে জগাই ও স্বামী যোগীনের সামনে একটা গুর্খা সৈন্য কৌশল্যার তল পেটে গুলি করেছে। মা ঘুরে পরছে, পড়ল। আরেকটা গুর্খা সঙিনের ফলা উঁচিয়ে ছুটে যাচ্ছে।জগাইয়ের ও যোগীনের চিৎকার, না। কিন্তু সঙিনের শানিত ফলা চিরে দিচ্ছে পূর্ণ গর্ভ। জগাইরা ছুটে আসছে। তখনও মা ডানহাতে কাস্তে ধরে উঠে দাড়াচ্ছে, বা হাতে চেপে ধরেছে বুলেট – বেয় নেটে দীর্ণ পুর্ণগর্ভ পেট। তারপর ছেলেকে ছুটে আসতে দেখে মা সে সময়ও বলছে জয়চাঁদকেদেখিয়ে, ওই ঝে! যোগীন আর জগাই মাকে দুদিকে নড়া ধরে টেনে নিতে চায়, টেনে নিচ্ছে, আর আকাশচেরা তীব্র চিৎকার, নে গেল, নে গেল জগাই রে! সব নে গেল!.... মাকে টেনে নিতে নিতে, নিতে নিতে, নিতে নিতে, নিমেষে মা ভারি হয়ে গেল, দেহের ভর ছেড়ে দিল। স্বামী পুত্রের হাতের উপর এলিয়ে গেল। আর শুইয়ে দেবার পর তখন দেখাগেল চেড়া পেট থেকে বেড়িয়ে এসেছে ছেলের মাথা, ছেলের হাত।"[৫৯]

রক্ত ঝরা বিপ্লবের মহাপ্রান কৌশল্যা। এরা আন্দোলন করে, প্রতিবাদ করে, মৃত্যু বরণ করে অসহ্য জ্বালা যন্ত্রনাকে হাহাকারকে বুকে নিয়ে। আর এদের ছেলে সন্তান উত্তরাধিকারীদের এখনও না খেয়ে থাকতে হয়। অসহায় জীবন যাপন করতে হয়। পরনের কাপড়, পেটের ভাত, কাজের জন্য লড়াই আজও করতে হয়। তেভাগা লড়াই সম্পূর্ন হয়। কৌশল্যারা প্রান দিয়েও নিজের রাজ্যকে কেন্দ্রের শাসিত শক্তির দালালদের হাত থেকে

রক্ষা করে। কিন্তু সে স্বপ্ন সত্যি হলেও দেখা দেয় অন্য আর এক সমস্যা। পুলিশের এলোপাথারী গুলি কামানের গোলা বারুদ। জোতদারের হিংসাত্মক নীতি হাজার হাজার সাধারণ দরিদ্র মানুষের প্রানকে ধ্বংস করে দিয়েছে। জোতদার, পুলিশ সৈন্য, মেজিস্ট্রেট, কমিশনার এরা প্রত্যেকেই সাধারণ মানুষের বিপক্ষে ছিল। এরাই ষড়যন্ত্র করে সাধারন হতদরিদ্র অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের ধ্বংসের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এদের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ। কৌশল্যার মৃত্যু হয় আর এই মৃত্যুকে হাতিয়ার বানায় বিদ্রোহী দলের নেতারা। কৌশল্যার মৃত দেহকে লাল নিশানে আবৃত করে শ্লোগান দেয়,

"কৌশল্যা, জয়চাঁদ!
তোমাদের ভুলবো নাল
দূর্গামনি, রাই মনি!
তোমাদের ভুলবো না।
অন্নপূর্ণা মা জননী!
তোমাদের ভুলবো না।
তেভাগার লড়াই থামবে না।
থামবে না থামবে না।
খুনি পুলিশ নিপাদ যাও
নিপাদ যাও নিপাদ যাও
গুর্খা সৈন্য বাংলা ছাড়
আবাদ ছাড়, ধান জুড়ি ছাড়ো।"[৬০]

এই আন্দোলন দৃঢ়ভাবে শুরু হয় এবং শেষ হয় লড়াই। কিন্তু আন্দোলন শেষ হয় না। তাইতো জয়চাঁদ যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল সে আন্দোলনের বীজ জীবিত রাখার জন্য বড় হয়ে উঠেছে জগাই, সুবল, প্রভৃতি সাধারণ নিরন্ন অসহায় মানুষ গুলি। জগাইয়ের স্বপ্ন এই আন্দোলনেরই প্রস্তুতির স্বপ্ন। জগাই প্রতি নিয়ত স্বপ্নে মা কৌশল্যাকে দেখে।

"জগাই এখন দেখতে পায় চরাচর ব্যাপি গাঢ় অন্ধকারে
সুন্দর বনের ও কাক দ্বীপের সকল গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র দস্যুর

> হাত থেকে বাঁচাতে কৌশল্যার জ্যোতির্ময়ী মূর্তি, আকাশ ঢাকা তার রক্ত মাখা এলো চুল, এক হাতে রক্তাক্ত বুলেট – বেয়নেটে দীর্ণপূর্ণ গর্ভ চেপে অন্যহাতে কাস্তে তুলে মায়ের ছুটে আসা শুকনো গলায় বলে, জয়চাঁদ কমরেট রে নে যাচ্ছিল গুর্খা মেলেটারি। জয়চাঁদ বলিছিল, মরিবাঁচি কৌশল্যা বুশ, লাশ দিওনি দুশমনেরে।”[৬১]

জগাই, সুবলদের মতো দরিদ্র মানুষেরাই হয়ে ওঠে পরবর্তি প্রজন্মের আন্দোলনকারী। কেননা রাজনৈতিক নেতারা ভোটের সময় আসে ভোটের জন্য ভোটে জিতে গেলে পরবর্তী ভোট না আসা পর্যন্ত আর সেই নেতা কমরেডদের দেখা পাওয়া যায় না। তারা গদিতে বসে সুখে স্বাচ্ছন্দে দিন যাপন করে। আর অসহায় দরিদ্র শ্রেণির মানুষেরা দু:খে কষ্টে থাকে। এদের জমি থাকে না, ভূমি থাকে না, পূর্বেও যা অবস্থা ছিল বর্তমানেও এই একই অবস্থা থেকে যায়। তাই বিষ্ণু ও সজনৌ বাবুদের মধ্য উচ্চ শ্রেণির কমরেড নেতা দের বলে জগাই,

> “তোমাদের এক জোড়া জুতর দামে আমার এক মাস কেন বুঝি দু মাস ঝাবে, তা ‘বাবু’ সেজি আসতে পার,‘বাবু’ শুনতি মন্দনাগে? আমাদের মুকে বাবুই শুনবে গো,সাঁপুই বাবুর মুকে কমরেড শুনো একন।”[৬২]

নেতা কমরেডদের মুখের কথা আর আচরনের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। মুখে দশজন গরীবের কথা বলে, সাধারন দরিদ্র শ্রেণির মানুষের কথা বলে, লোক দেখিয়ে গরীবের জন্য চোখের জলও ফেলে কিন্তু বাস্তবে সেটা শুধু অভিনয়। রাজ নৈতিক নেতা যখন বলে, ‘কৌশল্যার মৃত্যু নেই, তার মরন হতে পারে না। এক কৌশল্যা আজ লক্ষ জনের প্রেরনা। ভুলে যেওনা সে কথা। .....কৌশল্যা মরেনি।’৬৩ জগাইয়ের অবুঝ

কৃষক অশিক্ষিত মন সাধারনত জটিল কথা বুঝতে পারে না। তাইতো সোজা সাপটা কথায় বলে দেয়,

> "শত কৌশল্যা নিত্য মরতেচে। জমি নি, জেরাতনি, বিচার নি, ভাত নি, তা ঝে ঝন্যি তেনার পেয়জনছেল তা তো হয়েচে। তোমরা গদি পেয়েচ, মন্ত্রী হয়েচ, জ্ঞাতগুষ্টি চেলা চামুন্ডা সব্বস্য খাচ্চো, এবার আমাদের ক্ষ্যামা দাও। লড়াইয়ের কতানি, হক আদায়ের কতানি, হেঁসো কাস্তা ধরার কতানি। অত মিটিন করার, বক্তিমে শোনার কতা আবাদি মানুষ বুজে না।"[৬৪]

সাধারণ মানুষ, দরিদ্র সীমার নিম্নে বসবাসকারী মানুষ রাজনীতি বুঝে না। বুঝে পেটের ক্ষুধা। তাইতো সোজা কথা সোজাসাপটা ভাবে বলে দেয়। রাজনীতির গ্যাড়াকলে বলে না। পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার যেভাবে শাসন ও শোষন করেছে, স্বাধীন হওয়ার পর জোতদার, জমিদার এবং উচ্চ পদস্ত সরকারি কর্মচারী, প্রশাসনিক পুলিশেরাও তাই করছে। তাইতো সাধারণ মানুষ সদ্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বসা সরকারের প্রতি আস্থা রাখতে পারে নি। যার ফল স্বরূপ দেখা দেয় তেভাগা আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল ভিত্তিছিল শান্তিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকা এবং দুবেলা দুমুঠো ভাত ও কাপড়ের স্বাধীনতা। যা দান করতে ব্যর্থ স্বাধীনতার পরবর্তি নতুন সরকার। সে কারনেই এদের স্বপ্ন হয়ে ওঠে আন্দোলনের হাতিয়ার।এই স্বপ্নই ব্যক্ত করেছেন মৃত্যুপথগামী কৌশল্যা,

> "ওই, ওই দেখতে পাচ্ছি সব লালা হয়ে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি এসেছে জনগনের সরকার। দেখতে পাচ্ছি সে সরকার আমার এই রক্তদানকে বৃথা হতে দিবে না। সে ফসল করবেই করবে বর্গাদার দের জমিতে স্বত্ব আর আধা ফসলের অধিকার। সে ক্ষুধাতুর নরনারীকে দিয়ে কাজ

করিয়ে নিয়ে গম দিবে। সব দেখতে পাচ্ছি, আর আমার কোন দু:খ নেই।”[৬৫]

বস্তুত মহাশ্বেতা দেবী ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সমসাময়িক সময়ের রাজনৈতিক চিত্র, তেভাগা আন্দোলনের স্বরূপ এবং বিধ্বংসী রূপকে বর্ণনা করতে গিয়ে কৌশল্যা নামক এক বিদ্রোহী নারী চরিত্রকেও তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কেননা সাধারনভাবে এই গল্পে রাজনৈতিক উত্তেজনার দিকগুলিকে লক্ষ করা গেলেও একটু গভীর ভাবে পাঠ করলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই গল্পে রাজনীতির বিধ্বংসী রূপের পাশাপাশি একজন মাতৃ চরিত্রের মূল স্বরূপকেও লক্ষ করতে পারি। যেখানে একজন গর্ভবতী আসহায় মা-ও অস্ত্র হাতে প্রশাসনিক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অভিপ্রায় নিয়ে স্বশরীরে হাজির হয়। এবং যার পরিনতি হয় অতীব করুন। এখানে একদিকে রয়েছে সমাজকে নির্যাতন আর অপরদিকে রয়েছে একজন নারী চরিত্রের প্রতি পশুর মতো ব্যবহার। যেখানে একজন মাতৃ গর্ভস্ত সন্তানও জমিদারী বা জোতদারী অথবা প্রশাসনিক শক্তির নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পায় নি। অপর দিকে শুধুমাত্র নিজের কথা বা নিজের পরিবারের কথা না ভেবে একজন অন্ত:সত্তা নারীকে সমাজ ভাবনা এবং সমাজ চিন্তা এতটাই ভাবিয়ে তুলেছে যে নিজে শারীরিক ভাবে অসহায় ও বিকার গ্রস্থ হওয়ার সত্ত্বেও নিজের জীবনের এবং ভবিষ্যতের কোনো কথা না ভেবেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। নিজের এবং অন্ত:সত্তা সন্তানের মৃত্যু বরণকে মাথা পেতে নিয়েছে অথচ স্বপ্ন দেখেছে শোষন হীন, নির্যাতন হীন, সুন্দর, সুশ্রী এক সমাজকে গঠন করার। বাংলা সাহিত্যের জগতে এরকম মাতৃচরিত্র অতিবিরল বলে মনে হয় না। বলতেই হয় কৌশল্যার প্রতিবাদ শুধুমাত্র প্রতিবাদ বা আন্দোলনেই শেষ হয়ে যায় না, তা আগামী সম্ভাবনার শিখাটিকেও প্রজ্বলিত করে রাখে।

তথ্যসূত্র

১. প্রশংসা বা প্রচারে বিশ্বাসী নই, মহাশ্বেতা দেবীর সাক্ষাৎকার, অমর মিত্র, শিল্প সাহিত্য, মহাশ্বেতা দেবী সংখ্যা, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-২০০৯, পৃ-৯১

২. মহাশ্বেতা শ্রেষ্ঠগল্প, সম্পা:- অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা পৃ-৬১

৩. তদেব, পৃ-৬১

৪. তদেব, পৃ-৬৮

৫. তদেব, পৃ-৭০

৬. তদেব, পৃ-৭০-৭১

৭. মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র, ৮ম খন্ড, সম্পা: অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, পৃ-৫৪৫

৮. মহাশ্বেতা শ্রেষ্ঠগল্প, সম্পা:- অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৬৯

৯. তদেব, পৃ-৬৫

১০. মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র, ১১ তম খন্ড, সম্পা: অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-২৭১

১১. তদেব, পৃ- ২৭২

১২. তদেব, পৃ-২৭৩

১৩. তদেব, পৃ-২৭১

১৪. তদেব, পৃ-২৭৬

১৫. তদেব, পৃ-২৭৬

১৬. তদেব, পৃ-২৭৮

১৭. তদেব, পৃ-২৭৮

১৮. তদেব, পৃ-২৭৮

১৯. মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র, ১৩ তম খন্ড, সম্পা: অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৩২৪

২০. তদেব, পৃ-৩৩৪

২১. তদেব, পৃ-৩৪৩

২২. তদেব, পৃ-৩৪৬

২৩. তদেব, পৃ-৩৫২

২৪. তদেব, পৃ-৩৫৩

২৫. তদেব, পৃ-৩৫৫

২৬. তদেব, পৃ-৩৬৭

২৭. তদেব, পৃ-৩৭৩

২৮. তদেব, পৃ-৩৫৬

২৯. তদেব, পৃ-৩৫৬

৩০. তদেব, পৃ-৩৭৯

৩১ . তদেব, পৃ-৩৫৫

৩২. তদেব, পৃ-১১-১২

৩৩. তদেব, পৃ-৪২২

৩৪. তদেব, পৃ-৪৩৭

৩৫. তদেব, পৃ-৪৩৮

৩৬. তদেব, পৃ-৪৩৮

৩৭. তদেব, পৃ-৪৪০

৩৮. তদেব, পৃ-৪৪০

৩৯. মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র, ১০ম খন্ড, সম্পা: অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৫৬১

৪০. তদেব, পৃ-৩৫২

৪১. তদেব, পৃ-৩৫২/৩৫৩

৪২. তদেব, পৃ-৩৫৩

৪৩. তদেব, পৃ-৩৫৪

৪৪. তদেব, পৃ-৩৫৭/৩৫৮

৪৫. তদেব, পৃ-৩৫৮

৪৬. তদেব, পৃ-৩৬০

৪৭. তদেব, পৃ-৩৬০

৪৮. তদেব, পৃ-৩৬৩

৪৯. তদেব, পৃ-৫৬১/৫৬২

৫০. মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র, ২য় খন্ড, সম্পা: অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৪০৪

৫১. তদেব, পৃ-৪০৪

৫২. মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র, ৩য় খন্ড, সম্পা: অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৪৯৮

৫৩. তদেব, পৃ-৫০০

৫৪. মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র, ৫ম খন্ড, সম্পা: অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৪৯২

৫৫. তদেব, পৃ-৪৯৫

৫৬. মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র, ৩য় খন্ড, সম্পা: অজয় গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ-৪৬৪

৫৭. তদেব, পৃ-৩৫৮

৫৮. তদেব, পৃ-৩৫৮

৫৯. তদেব, পৃ-৩৫৮/৩৫৯

৬০. তদেব, পৃ-৩৬০

৬১. তদেব, পৃ-৩৩৯

৬২. তদেব, পৃ-৩৩১

৬৩. তদেব, পৃ-৩৩৯

৬৪. তদেব, পৃ-৩৩৯

৬৫. তদেব, পৃ-৩৪৫